পরমপূজ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সুজিতকুমার নাগ

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

পরমপূজ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

: আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ :

বিনয়-বাদল-দীনেশ

মহানায়ক সুভাষচন্দ্র

অধিনায়ক সূর্যসেন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

কিশোর কবি সুকান্ত

বিদ্রোহী কবি নজরুল

বিদূষক দাদা ঠাকুর

চারণকবি মুকুন্দ দাস

বীর সাধক বিবেকানন্দ

দানবীর বিদ্যাসাগর

ভারত পথিক রামমোহন

বাংলার কবি জীবনানন্দ

ঋষি অরবিন্দ

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

বিজ্ঞান সারথি জগদীশচন্দ্র

প্রত্যেকটির মূল্য—৫.০০

বাংলার বাউল লালন ফকির—৬.০০

অন্ধকারের তীরে দাঁড়িয়ে কুহেলিবিহীন তমসাবৃত মনে; কার জ্যোতির্ময় শিখার স্পর্শে বিস্ময়ে চমকে উঠি, মহাসমুদ্রের কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে, মনের গহন পটে আশ্চর্য আলোকের প্রতিধ্বনি ঘটে।

মনে হয়, কোন সংশয়ের তীরে, এক মহান জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর জীবন সমুদ্রের তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন উত্তাল তরঙ্গে। সবই যেন তাঁরই প্রকাশ আপন লীলাভূমিতে। চির চেনার চির রহস্যময়, চির মধুর সেই নাম।

করুণাঘন, পরম পুরুষ সেই মধুর নাম 'রামকৃষ্ণ'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগে বাংলা দেশের ইতিহাস ছিল স্বর্ণযুগের স্মৃতি সৌরভ। দিগ-দিগন্তে মুখরিত ছিল বাঙলার ও ভারতের জাতীয় চেতনা। বিদেশী শাসনের অন্তরালে উদ্ভাসিত হয়েছিল, বিরাট বিপ্লব। সমগ্র জাতীয় জীবনে এনেছিল আঘাত আর দুঃখের মাধ্যমে আশার আলো। চিরন্তন। কালজয়ের ইতিহাসে সেই ঘোর ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, যুগের প্রয়োজনে এসেছেন এ ধরণীর বুকে যুগনারায়ণ।

অগ্রসর হই আরও অনেক আগের সেই সত্যযুগে, একদিন এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সঙ্গে করে এনেছিলেন সত্যের শিখা, চরম ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন সত্যনিষ্ঠ আদর্শ, দমন করেছিলেন পাশববৃত্তিকে—রাক্ষসদিগকে দমন করার জন্য সত্যযুগে এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সে সব স্বর্ণ ইতিহাস আমাদের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। তারপর ঘটনার স্মৃতিতীর্থে দেখি দ্বাপরযুগে যুগলীলায় অবতীর্ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, অপূর্ব ঐশ্বরিক প্রভাবে বুদ্ধিকে জয় করে পৃথিবীকে করেছেন মুক্ত···শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জ্ঞান গরিমায় দেখা গেল এক নতুন ইতিহাস, সে বেদমন্ত্র গীতায় পেয়েছি আমরা। দেখেছি তারই প্রতিধ্বনি যুগে যুগে, সেই পথের নিশানা নিয়ে অহিংসা পরম ধর্মের পূজারীরূপে ভগবান তথাগত মহান বুদ্ধদেব। এলেন ত্যাগ ও ধর্মের সত্যব্রতীরূপে চিরবরেণ্য যীশুখ্রীষ্ট। তারপর আরও আলোর শিখা নিয়ে এই ধরণীর পাপ পঙ্কিলতাকে দূর করে দিলেন প্রেমের বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেব। কালের ঘটনায় কালহীন স্রোতে এলেন কত মহান মনীষীবৃন্দ। তাঁরা এসেছিলেন মানুষের কাছে। তাঁদের ত্যাগ ও ধর্মের সত্যশিখাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরলেন। যুগে যুগে এই

চিরন্তনী আসা যাওয়ার পদধ্বনিতে আমরা দেখেছি সেই একই মিছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে দীপ্ত অভিযান।

প্রসঙ্গত মনে আসে, সেই বাঙলাদেশের যুগ সন্ধিক্ষণে দেখা গেছে পশ্চিমের বুক থেকে যে ঢেউ জেগেছিল এই দেশের উপর, আশা-নিরাশার, ব্যথা-বেদনার, স্বার্থপর সংঘাতে ভরা বিষাক্ত পৃথিবীর বুকে বইয়েছিল বিলাসের বন্যা···হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এই বাঙলাদেশের কোলে জন্মগ্রহণ করলেন মনীষীবৃন্দরা। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা রইলো তাঁর নবজন্ম। ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই বাঙলাদেশের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

তবুও সেই ঘন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সংশয়ে ঘেরা আলোর শিখা নিয়ে এ যুগে অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেই মধুর নাম, রাম আর কৃষ্ণ···মনে পড়ে···এই উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ···যিনি রাম· ·তিনিই কৃষ্ণ···এক দেহে···এক আত্মায় পরস্পর মিলেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর যুগ পরিবর্তনে যুগ নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা রইবে চিরদিন···কাল থেকে কালে···যুগ থেকে যুগে···তাঁরই নামে মুখর হয়ে উঠবে।

অতীতের স্মৃতিরা আজ আমাদের কাছে ছায়া মাত্র, তবুও সত্য হয়ে আছে, জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের কাছে। আজ যে দিকে তাকাই, দেখি ঠাকুরের নাম···তাঁরই গানে মুখর হয়ে আছে দিগ-দিগন্ত। চির রহস্যময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছি। সেদিনের পথহারা যাত্রীরা তাঁর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর ত্যাগ ও সাধনার মন্ত্র নিয়েছিলেন নবীন সন্ন্যাসীরা···তাঁদের নাম আমাদের কাছে পবিত্র হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকাতলে একদিন সমবেত হয়েছিলেন সে যুগের শক্তিমান পুরুষরা···ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের সেই দিনের পথচলায় আগামী কালের পথিকরা পেয়েছে চিরন্তনী পথের আলো। তাঁরই পতাকাতলে এসেছিলেন শরণার্থীর মতো দীন সেবকরা—মধুর কণ্ঠে তাঁদের ধ্বনিত হয়েছিল তাঁরই নাম। আর সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "মায়ের কাছে এসো তোমরা, মাতৃমন্ত্রে মুখরিত করে তোল—মাকে ডাকলে সব পাওয়া যায়। মাতৃমন্ত্রই তোমার মুক্তিরপথ।"

ঠাকুরের অমৃতময় মধুর বাণীতে কলগুঞ্জন করে উঠল অগণিত ভাবসাধকরা।

ছুটে এলেন কত বীরবৃন্দ, কত ধনী-দীন—এমন করে তাঁরই আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল কত মৌনতার শব্দ-তরঙ্গ। চকিতে মুখর হয়ে উঠল তাঁর মধুর বাণী। তাঁরই আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভর করলেন ভক্ত আর সাধকরা। আলোর স্পর্শে ধন্য হলো বাংলাদেশ। ভারতের বুকে জেগে উঠলো নতুন জোয়ার। বেদ-বেদান্তের সারমর্মকে উদ্ভাসিত করলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

তাঁরই প্রেরণায় আলোকিত হয়ে উঠল দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার তীরে চির পবিত্র তীর্থভূমি দক্ষিণেশ্বর। সেখানে বিরাজ করলেন আনন্দময়ী মা—সবার মা সারদা। মায়ের ডাকে ছুটে এলো কত সন্তান। প্রাণভরে ডাকলো সবাই 'মা আমরা এসেছি।' আর এই মায়ের শক্তির বিকাশ ঘটালেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী সারদা। ইতিহাসে সেই সব ঘটনা জীবন্ত হয়ে আছে।

ছায়ামিছিলের মত স্মৃতিতীর্থে দেখি পরম বিস্ময়ভরা মনের সংশয়ে বাঙলাদেশের শক্তিমান পুরুষও তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হয়ে আশার আলো পেলেন। তাঁদের জোয়ারে বাংলাদেশের মাটিতেও জেগেছিল আনন্দের শান্তির, সত্য সাধনার সন্ধান। সংশয় ভরা মন নিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, এলেন কেশবচন্দ্র সেন, বলরাম বসু, দুর্গাচরণ নাগ (সাধুনাগ মহাশয়) মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিমান পুরুষেরা। শুধু তাই নয় একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সঙ্গে মিলন ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের—এলেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে ঠাকুরের কী আশ্চর্য প্রভাবে সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দরা এসে তাঁরই চরণে নিজেদের চলার পথকে সুগম করে, মানব সেবায় ধন্য হয়েছিলেন। লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ), হরিনাথ (স্বামী তুরীয়ানন্দ), শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ), শশিভূষণ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), গঙ্গাধর ঘটক (স্বামী অখণ্ডানন্দ) প্রভৃতি অগণিত সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দরা ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে তাঁদের জীবন সাধনাকে সফল করে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত মনে আসে একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওরে তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে—'

তাঁর সেই ডাকে হয়ত সেদিন ছুটে এসেছিল এই সব নবীন সন্ন্যাসীর দল। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে শুধু তারই প্রতিধ্বনি দেখা দেয়, শুধু ঢেউ—এই

বিরাট মহান জীবনের সমস্ত কাহিনী সেই জলতরঙ্গের ছায়া মাত্র নিয়ে দেখা দেয় বিস্ময়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকাতলে এলেন আর একজন বীর—বীর সাধক বিবেকানন্দ। আর সেই বিরাটের বিপ্লবের শিখা নিয়ে একদিন এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ বীরসাধক বিবেকানন্দ। পরমপুরুষ বলেছিলেন, ডাকো প্রাণভরে ডাকো। সেই আকুল ডাকে সাড়া দিলেন নরেন্দ্রনাথ। দক্ষিণেশ্বরে আলো করে বিরাজ করলেন সবার মা সারদা।

আর সবার উপরে মানুষ সত্য—এই ধরণীর বুকে হতাশা, গ্লানি আর বেদনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মহাশক্তির নব অধ্যায় সূচিত করে দিলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হলো অজানিত কালের মাধুরী—রূপে অপরূপে সার্থক হয়ে উঠল তাঁর সাধনা…তাঁর তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে উঠল মহাশক্তির পুণ্য-প্রভাব। মুক্তিকামী মানুষের জন্যে পরম পুরুষ সৃষ্টি করলেন তাঁর মধুর বাণী—।

হিমবাহের সঙ্গে তুলনা করলে যার শেষ হয় না—সেই মহান মহামানব পরম পূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন গাঁথার সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করা কেমন করে যায় তা আমার জানা নেই—এ গ্রন্থ শুধু তাঁরই শ্রদ্ধার দীনতম অঞ্জলি। 'যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ' এই চিরন্তনী সত্য সেই পরম পুরুষ মধুর নাম, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন-কাহিনী নিয়েই এ গ্রন্থের সূচনা।

হুগলী জেলার এক গ্রাম, নাম তার কামারপুকুর।

শান্ত নদী, নীলাকাশে ছড়িয়ে দেয় খুশীর ফোয়ারা। সবুজ ধান। শান্ত, সুনিবিড় একটি মায়া মমতায় ঘেরা কামারপুকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মভূমি—। আর এই গ্রামেই বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের জনক-জননী।

ইতিহাসের পাতা ওলটাতে গেলে আমাদের মনে আসে সেদিন সেই কামারপুকুর আর তার পরিবেশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাবে ধন্য হয়েছিল। আর আজকের কামারপুকুর পরম বিস্ময় হয়ে স্মৃতিতীর্থরূপে গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জনক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

নিষ্ঠাবান সহজ সরল ব্রাহ্মণ। তাঁর ত্যাগ, দান, ক্ষমা ছিল অপরিসীম। সত্যের জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। যার জন্য নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন সমস্ত কিছুকে এবং তাঁর সততার জন্য তিনি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন

দেবপুরের আদি নিবাস। জমিদারের মিথ্যা চক্রান্তে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। মিথ্যার জালে তিনি নিজেকে বিক্রি করেননি। ধ্রুবসত্য, চির সুন্দরের জন্য তাঁর সংগ্রাম। ছেড়ে দিয়ে এলেন তাঁর সর্বস্ব। চলে এলেন দেবপুর ছেড়ে কামারপুকুরে। আর এই কামারপুকুরই হল ঠাকুরের জন্মভূমি—সারা পৃথিবীর আজ তা তীর্থভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জননী চন্দ্রমণি অথবা চন্দ্রাদেবী স্বামীর মতনই ভক্তিমতি তিনি। আদর্শ লক্ষ্মীর মত তাঁর ছিল সব কাজের নিয়ম। তাঁর অন্তরে ছিল স্নেহ সুধার ধারা। চির আনন্দময়ী জননী চন্দ্রা।

ময়াময় গ্রামের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল জনক জননী তাঁদের সংসারে। অতীতের সব হারিয়ে যাওয়া সমস্ত সম্পদ যা ফেলে এসেছেন তাঁদের আদি নিবাস দেবপুরে···তার জন্য কোন ক্ষোভ ছিল না তাঁদেব।

অতীতের সেই কামারপুকুরের স্মৃতিময় দিনগুলির কথা আমাদের কাছে ইতিহাসের ছায়া মাত্র। পুরাতন ছিন্ন পাতায় দেখা গেছে তৎকালীন কামার-পুকুরের শান্ত নীলাকাশে ছিল অপূর্ব শোভনময় দৃশ্য। কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রাম্যময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নিয়ত কীর্তন, যাত্রা, আমোদ, উৎসবাদি লেগে ছিল।

স্মরণতীর্থে দেখা যায়, আজও পুরাতন ভগ্ন দেউলে রাসমঞ্চ, ইমারত, জমি প্রভৃতি কামারপুকুরের বিগত ঐশ্বর্যের পরিচয় নিয়ে জীবন্ত হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জনক ক্ষুদিরামের জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

কোন একটি কাজে তিনি কাছের কোনও গ্রামে চলেছেন। পথে ক্লান্ত, শ্রান্ত ক্ষুদিরাম। বিশ্রামের জন্য এক গাছের তলায় বসেছেন। গ্রামান্তর থেকে ঘরে ফেরার পথে। ক্লান্ত দেহে নিদ্রামগ্ন ক্ষুদিরাম। সেই সময়ে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন যেন বালক-বেশী শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বলেছেন, "ওরে কতদিন ধরে এই জায়গায় রয়েছি, কেউ আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায় না, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তুই আমাকে নিয়ে চল, আমি তোর পূজা ও সেবা গ্রহণ করব।"

বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে নিদ্রার মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম বললেন: "প্রভু অতিদীন, ভক্তিবিহীন, আমার দরিদ্র ঘরে তোমাকে কোন্ সাহসে নিয়ে যাবো?"

ক্ষুদিরামের কথার প্রতিধ্বনি দিলেন বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্র, বললেন,

"তোর কোন ভয় নেই—তোর সাধ্যমত তুই আমাকে সেবা করবি, তাতেই আমি তুষ্ট হব।"

রোমাঞ্চে, ভয়ে, আবেগে বিভোর ক্ষুদিরাম অভিভূত হয়ে গেলেন। খানিক পরে তাঁর নিদ্রা টুটে গেল। জেগে উঠলেন ক্ষুদিরাম। পরম বিস্ময়ে··· রোমাঞ্চে তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল যেন, তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ভাবলেন···কে এসেছেন তাঁর কাছে? স্পষ্টই দেখলেন স্বপ্নের দেখা সেই আশ্চর্য সমস্ত ঘটনা মিলে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে··স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি সেরকম স্থান, আরও বিস্ময় তাঁর কাছে সব কিছু···স্বপ্নদেখা অবিকল সেই স্থান। ক্ষুদিরাম দেখলেন, একটি শালগ্রাম শিলা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ফণা বিস্তার করে সেই শিলাখণ্ডকে রৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা করছে···ক্ষুদিরামের মনে হল এ স্বপ্ন নয় এ সত্যি···যুগে যুগে ভগবান আসেন ভক্তকে পরীক্ষা করতে···হয়ত এই সেই স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র···আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভক্তিতে হৃদয় তাঁর টলমল। ক্ষুদিরাম প্রকাণ্ড বিষধর সাপকে আর গ্রাহ্য করলেন না, শালগ্রাম ধরবার জন্য হাত বাড়ালেন। আশ্চর্য! সাপ তার ফণা গুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। ক্ষুদিরাম শালগ্রামটিকে সযত্নে বুকে তুলে নিলেন। শিলাকে তিনি দেখলেন যেন রঘুবীরের শীলা।

গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন রঘুবীরের।

ক্ষুদিরামের দিনগুলি কেটে চলেছে ধ্যানের মধ্য দিয়ে। তাঁর মনে এসেছে বৈরাগ্যের সাধনা···। অভাব এসেছে, কিন্তু তাতে তাঁর মন বিচলিত হয়নি, সংগ্রামে তিনি হননি ক্লান্ত।

সত্যনিষ্ঠা আর সাহসের ফলেই তিনি ছেড়ে এসেছিলেন দেবপুরের পৈতৃক বাসভূমি। নানা দিব্য-দর্শনে ঈশ্বরের অনুগ্রহে গ্রামের সকলের কাছে হয়ে উঠলেন বরেণ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র···নাম তার রামকুমার। কন্যা ক্যাতায়নী। পুত্র রামকুমার, পিতার মতই পণ্ডিত ও ধার্মিক।

দাক্ষিণাত্যে আসার পর ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, নাম রামেশ্বর। আর চন্দ্রাদেবী, আদর্শ ধর্মপত্নী। চন্দ্রাদেবী আপন স্বভাবে গ্রামের মধ্যে সকলের কাছে ছিলেন আদর্শস্থানীয়া। সরল সুন্দর আনন্দময়ী ছিলেন জননী চন্দ্রা।

ক্ষুদিরাম ১২৪১ সনে তীর্থ যাত্রার পথে পা বাড়ালেন। যদিও এর আগে তিনি গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। সেতুবন্ধ, রামেশ্বর ইত্যাদি অনেক তীর্থভূমিতে

ক্ষুদিরাম গিয়েছিলেন। এবার যাচ্ছেন গয়া-তীর্থে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান উদ্দেশ্যে। তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তিনি আবার পেলেন এক আশ্চর্য দেব-দর্শন।

অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তিনি এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন।

ক্ষুদিরাম দেখলেন, তিনি যেন পিণ্ডদানে নিয়োজিত রয়েছেন, আর পিতৃপুরুষেরা জ্যোর্তিময় শরীরে উপস্থিত রয়েছেন···তাঁর নিবেদিত পিণ্ড জ্যোতির্ময় শরীরে ধারণ করেছেন। এক অপূর্ব স্বর্গীয় মহান দৃশ্যের ছবি ঘটে গেল সহসা। ক্ষুদিরাম দেখলেন, তিনি যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, ভক্তচিত্তে পিতৃ-পুরুষের চরণ-বন্দনা করছেন। এমন সময় মন্দিরাভ্যন্তর যেন সহসা দিবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর ক্ষুদিরাম দেখলেন স্বর্ণসিংহাসনে এক দিব্যপুরুষ, আর পিতৃপুরুষেরা দুইপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তবগান করছেন। ক্ষুদিরামের চোখে ও মুখে আনন্দের ও অশ্রুর বন্যা। সেই সিংহাসনারূঢ় দিব্যপুরুষ তাঁকে সস্নেহে বললেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট আমি এবার তোমার পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্ম নিয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করব।"

দেবদর্শনে ও স্বপ্নদর্শনে ক্ষুদিরাম অভিভূত হয়ে গেলেন, ভয়ে ও আবেগে ক্ষুদিরাম নিবেদন করলেন, বললেন, "না, না, এত সৌভাগ্য আমার সইবেনা, আমি দরিদ্র ·আমাকে অপরাগ করবেন না।" উত্তর শুনে দিব্যপুরুষ প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "ভয় নেই ক্ষুদিরাম! তুমি যা দেবে, তাতেই আমি পরিতুষ্ট হব · আমার অভিলাষে তুমি বাধা দিও না।"

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। জেগে উঠলেন ক্ষুদিরাম। ভাবলেন, কী দেখলেন তিনি? কাকে দেখলেন? কোন্ পরম পুরুষ তাঁকে দিলেন দুর্লভ দেবদর্শন? কয়েকদিন পর ফিরে এলেন কামারপুকুরে। তখন বৈশাখ মাস।

ক্ষুদিরাম যখন গয়ায় ছিলেন, তখন কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীও নানা অলৌকিক দৃশ্য দর্শন লাভ করেছিলেন।

বাড়ীর কাছেই ছিল যুগীদের শিবমন্দির।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রাদেবী···মহাদেবকে দেখেছেন। সহসা তাঁর মনে হলো, যেন এক প্রগাঢ় দিব্যজ্যোতি শিবলিঙ্গ থেকে ছুটে এসে তাঁর দেহভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে···। ভয়ে আতঙ্কে চন্দ্রাদেবী মূর্চ্ছিতা হলেন···। জ্ঞান হারিয়েছেন চন্দ্রাদেবী···। ধনি নামে এক প্রতিবেশিনী তখন চন্দ্রাদেবীকে নিয়ে এলেন ধরে।

এমনি করে দিন কেটে যায় চন্দ্রাদেবীর।

ঘরের কাজ করতে করতে চন্দ্রাদেবী যেন অনুভব করলেন, গৃহ যেন দিব্যগন্ধে আমোদিত···দূর থেকে আসছে সঙ্গীতের সুর···

আশ্চর্য অনুভূতি···। শ্রদ্ধায় ভয়ে, তাঁর অন্তর আলোকিত।

ফিরে এসেছেন ক্ষুদিরাম। সেই অদ্ভুত দিব্যদর্শন তাঁর অন্তরে গাঁথা রয়েছে···।

চন্দ্রাদেবী তখন সমস্ত কথা বললেন ক্ষুদিরামকে···তাঁর নিজের নানাবিধ অলৌকিক দর্শন···।

ক্ষুদিরাম আশ্চর্য হয়ে গেছেন ··। তিনিও বললেন, তাঁর দিব্যদর্শন, সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের কথা।

চন্দ্রাদেবীর অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল ··দেবীর মত তাঁর রূপ লাবণ্য তাঁর কোলে আসছেন যুগের নারায়ণ।

ক্ষুদিরাম বললেন, ঈশ্বর আমাদের দয়া করবেন। নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের ঘরে।

চন্দ্রাদেবী অনুভব করলেন যেন কোন এক জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছেন তিনি। পরম পুলকিতা তিনি।

গর্ভবতী হলেন চন্দ্রাদেবী। রঘুবীরের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন কবে আসবেন সেই শ্যাম গদাধর? অবশেষে এলো সেই দিন··।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হলেন এ ধরার বুকে ৬ই ফাল্গুন ১২৪২ সালে।

জনক জননী পুত্রের নাম রাখলেন গদাধর।

আর এই গদাধর ··যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সারা পৃথিবীর কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

সেই গদাধরের বাল্যকাল আর কৈশোর কালের ঘটনা এখন শুরু করছি।

গদাধর বড় হতে লাগলেন।

শ্যামল গদাধর সকলের প্রিয়। যে দেখেন সেই অবাক হয়ে ভাবেন কে এই বালক? যাঁর সারা চোখে ছড়িয়ে পড়েছে দেবজ্যোতি? যাঁর নয়নে রয়েছে করুণার ধারা। যাঁর চোখে মুখে গভীর রহস্য।

গদাধর বড় হতে লাগলেন। মায়াময় কামারপুকুর। প্রকৃতি যেন নিজেকেই সাজিয়ে রেখেছে। শান্তনদী, নীলাকাশ, খুশীর ফোয়ারা সবই যেন মধুময়। কচি কিশলয়ের পাতা তারাও সজীব।

গদাধরের পুণ্য-পদ-চিহ্নতে স্মৃতি হয়ে ওঠে কামারপুকুর। গদাধরকে দেখার

নিত্য অভিলাষ জমে ওঠে পল্লীবাসীদের। গদাধর তাদের কাছে চিরবিস্ময়।

কাল এগিয়ে চলে। তিন বছর বয়স এখন গদাধরের।

মনোহরকান্ত চিরশ্যামল ঘনশ্যাম বালক গদাধর। ভাবে, আবেগে বিভোর।

অশান্ত গদাধর। ছোট বোন সর্বমঙ্গলা সবেমাত্র এসেছে ধরায়। তিন বছরের গদাধর এই বয়সেই নানা দেব-দেবীর স্তোত্র—প্রণাম মন্ত্র শিখে নিলেন।

পিতামাতার বিস্ময়, চিররহস্য দিয়ে ঘেরা মধুর হয়ে ওঠে গদাধর। কি মোহন মোহিনী শক্তি গদাধরের, দেখেও যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। কামারপুকুরের রমণীরা দেখেন প্রাণভরে, হয়ত তখন মনে পড়ে···এমনি করেই একদিন ব্রজের বাঁশী বেজেছিল বৃন্দাবনে ·আর কামারপুকুরে তারই ছায়া এসেছে।

সময়ের তালে চলে দিন। গদাধর পাঁচ বছরে পা দিলেন।

লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে গ্রামের পাঠশালা। সেই পাঠশালাতে গদাধরকে ভর্তি করে দিলেন ক্ষুদিরাম।

পাঠশালার পাঠ যেন গদাধরের কাছে অসত্য, মন তাঁর এখন থেকেই আরেক জগতে, নির্জনতার নিত্য সাথী। তাই উধাও এই পাঠের জগত থেকে তাঁর মন। তাঁর মন তখন ছায়া মেলাত কামারপুকুরের শান্ত নদী, হালদার বাড়ীর পুকুর। আরও অগ্রসর হত তাঁর ভাবুকমন। যাত্রা, কথকতার মধ্যে তাঁর তন্ময়তা। ধ্যানমগ্ন গদাধর। ভাবময় শিল্পী গদাধর যেন ছুটে যেতে চাইতেন সেই পুরানো যাত্রাদলে, কীর্তনে। আহা, মধুর সে নাম। কি হবে আমার পুঁথি বিদ্যা শিখে? আরও, আরও অগ্রসর ভাবময় ধ্যানময়' তাঁর মনে তখন ছায়া মেলত, 'চল চল মনে যেখানে দেখা যায় গান, মধুর সে তো···।' শিক্ষার দিক থেকে গদাধর বেশীদূর এগোতে না পারলেও, বাল্য বয়সে অদ্ভুত বোধশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গদাধর যাত্রাগান একবার দেখলেই তাকেই মনের মধ্যে গেঁথে রাখতেন। এমন কি যা দেখেছেন সেই সাজেই সেজে শিল্পী গদাধর রূপদক্ষ অভিনয় করে যেতে পারেন।

অশান্ত গদাধর, তখনই শান্ত, রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। রামায়ণ আর মহাভারতের সমস্ত চরিত্র যেন তাঁর চোখ জীবন্ত হয়ে উঠত। তাই তাঁর নির্জনতা ছিল খেলার সাথী যেখানে গ্রামের লোকেরা বলত ভূতের আড্ডা, আর সেই আড্ডায় সহজেই মিতালী পাতিয়ে আসতেন গদাধর। এমনি ছিলেন যেখানে ভয়, সেইখানে তাঁর জয়।

ভাবে, আবেগে, বিভোর গদাধর। তন্ময়তায় ঘেরা তার মন দেহ। যা

কিছু সুন্দর, প্রকৃতির, যা কিছু অভিনব পুরাণ কাহিনীর, কীর্তনমধুর গান···এই সব দেখতে ও শুনতে গদাধর হারিয়ে ফেলতেন তাঁর মন। একদিন নয়, বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাঁর জীবনে।

মনে পড়ে তাঁর বাল্যকালের ঘটনা।

ভাবরাজ্যের জগতে তাঁর মন, দিনলিপির পাতায় তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয়। সময়টা তখন জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় হবে। চলেছেন গদাধর ধার দিয়ে। সকাল বেলার তোকেয় মুড়ি নিয়ে মাঠের ধানক্ষেতের আল দিয়ে চলেছেন। আকাশ ঘিরে রয়েছে জলভরা মেঘ··। তন্ময় হয়ে দেখে চলেছেন ভাবুক গদাধর। ভাবরাজ্যে চলে গিয়েছে তাঁর মন। কল্পলোকের কল্পনায় আকাশের সাথে তাঁর মিতালী। আর অপরূপ সে দর্শন তাঁর। চলেছেন, কি আশ্চর্য তারপর দেখতে দেখতে আকাশ যেন আরও ঘন, আরও অন্ধকার হয়ে গেলো। ভাবুক গদাধর কবির দৃষ্টিই নিয়ে দেখেছেন। কী দেখলেন? কালো মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে এক ঝাঁক সাদা বক, সারি সারি চলেছে। অবাধ মুক্ত গতিতে। যেন চলার শেষ নেই। কবি-শিল্পী বালক গদাধর যেন ভাব সমাধির তীরে এসে গেছেন। তারপর? তারপর মনের আকাশে মেঘ আরও আশ্চর্য তার প্রকাশ প্রকৃতির অপরূপ লীলায় ছুটে চলেছে অবাধ গতিতে শুভ্র বকের দল। ভাবুক গদাধরের মনে অপার বিস্ময়, তাঁর মন তখন আরেক ভাবজগতে, কোন অসীম আলোকে মুক্তির স্বাদ? মহান দৃশ্য দেখে বালক গদাধরের সমস্ত চেতনা লুপ্ত হল···

এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাই বলি এবার।

"সে যেন এক বাহার। দেখতে দেখতে, অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে আর হুঁশ রইলো না। পড়ে গেলুম···মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল···কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)

এমনি ঘটনার পর মায়ের মনে জাগে ভয়, কি জানি আবার যদি ঘটে। জনক-জননীর মন মানে না। মানত করলেন দেবতার মন্দিরে, প্রার্থনা জানালেন আর যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে।

দেখতে দেখতে সময় এগিয়ে চলে···কি বিচিত্র তাঁর বাল্যকাল।

একবার কামারপুকুরে শিবরাত্রি উপলক্ষে গ্রামে ছেলেরা যাত্রা করছে। যাত্রাদলের শিব রোগে শয্যাগত, শিব সাজবে কে? কে আবার? পাগল গদাধর।

স্মরণের দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাই। সেদিনের আনন্দময় কামারপুকুরের অগণিত শ্রোতাদের চোখের সামনে শ্যামল গদাধর মনোহররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন…আর তাঁকে দেখামাত্রই পুলকিত সমবেত নরনারীরা। ধীর মন্থর গদাধর…সারা অঙ্গে ভস্ম…মাথায় জটা…রুদ্রাক্ষের মালা…হাতে ত্রিশূল। স্বয়ং যুগদেব মহাদেব অবতীর্ণ হয়েছেন। সমবেত পল্লীবাসীরা আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি। বিস্মিত পুরনারীরা। আর গদাধর? তাঁর না আছে খেয়াল, না আছে লাজ। তিনি তখন আর এক ভাব জগতে। বিশ্বের যা কিছু ভালো মন্দ, যা কিছু বর্তমান, সব যেন তাঁর সীমানার বাইরে। চুপ। একটা কথাও তাঁর মুখে নেই।

সমবেত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা, কেউ বললেন: কি হল?

কিন্তু গদাধর সে যেন আজ পাষাণ হয়ে গিয়েছে। স্থির এবং নিশ্চিন্ত চুপ করে আছেন। একটাও কথা নেই। দলের অধিকারী বালক গদাধরের কাছে গেলেন। আশ্চর্য! হাত, পা, অসাড়। সম্পূর্ণ চেতনাহীন। তাঁর নয়নে অশ্রুর ধারা। চোখে তাঁর অপূর্ব ভাবাবেশ। গভীর ধ্যানমগ্নতায় গদাধর আচ্ছন্ন। ধ্যানমগ্ন যোগীরাজ গদাধর সে আর নিজের মধ্যে বলতে কিছু নেই। অনেক চেষ্টা করেও সবাই দেখলেন গদাধর এখন ভাব-সমাধি তীরে। তারপর সেই ভাবমগ্ন অবস্থাতেই গদাধরকে সবাই নিয়ে এলেন বাড়ীতে। বাড়ীতে এসেও গদাধর তাঁর জ্ঞান ফিরে পায় নি। সারারাত তিনি ভাবময় জগতের মধ্যে ডুবে ছিলেন। ভাব-সমাধি কেটে গেল তার পরের দিন, যখন সূর্যোদয় হল।

এমনি করে কামারপুকুরে কেটে যায় দিন। আপন লীলাভূমিতে কামারপুকুরের গদাধর আরও যেন মধুর হয়ে ওঠেন সকলের কাছে।

স্মরণতীর্থে জেগে ওঠে তাঁর বাল্যকালের মধুর ভাব-সমাধির কথা।

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর থেকে এক মাইল দূরে আমুড় নামে একটি গ্রাম। আমুড়ের বিশালক্ষী মন্দিরে দেবী জাগ্রতা। দেবীর কাছে সবাই যায় মানত করে, তাঁর দয়াতে মনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই আশায় চলেছেন কামারপুকুরের ভক্তিমতী রমণীরা।

ভক্তিমতী প্রসন্নময়ীও যাবেন। বালক গদাধর তাঁর প্রিয় সঙ্গী। গ্রামেই জমিদার ধর্মদাস লাহার কন্যা ভক্তিমতী প্রসন্নময়ীকে গদাধরের খুবই ভালো লাগত। আর প্রসন্নময়ী তিনিও ঠাকুরকে খুবই স্নেহ করতেন। অন্তরে তাঁর ধ্যান ছিল গদাধর সত্যই গদাধর।

আশ্চর্য ভক্তি নিষ্ঠায় ধর্মমনা ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী। ঠাকুর তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রসন্নময়ীর সরলতা, ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে সারদা দেবীর কাছে উল্লেখ করেছেন। ঠাকুর তাঁর স্ত্রীভক্তদেরও বলতেন প্রসন্নময়ীর কথা···।

প্রসন্নময়ী বলতেন গদাধরকে: গদাই তোকে যেন মনে হয় তুই ঠাকুর।

গদাধরের মুখে মধুর হাসি।

প্রসন্নময়ীর মনে তখনও বিস্ময়, বলতেন। "তুই আমাকে ভোলালে কি হবে? তুই কিন্তু মানুস নয়।"

কথা প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী বলতেন? গদাধরের গান শুনলে মনে হয় এ যেন ঠাকুরের গান, তাঁরই মুখ দিয়ে শুনছি। মন্দিরে যিনি থাকেন, সেই গদাধর আর এই গদাধর একই।

শুভ যাত্রায় চলেছেন প্রসন্নময়ী দেবী। শুনে গদাধর বললেন আমিও যাব। যাবার বাসনা হয়েছে তখন বাধা দেবার কে? গদাধর হলেন তাদের সাথী। আর গদাধর? তাঁর কণ্ঠে মধুর গান। দেবতার নাম। গানের ভাবে বিভোর গদাধর। গদাধরের কণ্ঠে যেন আজ মধুর সুরে ভরা। পা চলতে চলতে আজ সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বৃন্দাবনের পথেও একদিন এমনি ঘটনা ঘটেছিল, সেই পথ ধরেই চলেছিলেন একদিন বালক গোপাল···আর আজ কামারপুকুরের পথে চলেছেন শ্যামল গদাধর। আপন ভূমিতে তাঁর লীলা: যাত্রিনীরাও চলেছেন, তাঁরাও আজ যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। ভক্তিমতী প্রসন্নময়ীর চোখে জল। এমন মধুর কণ্ঠের ডাক যেন কোনদিন গদাধরের কণ্ঠে শোনেনি কেউ। ভাবের আসরে আজ গদাধর ডুবে গিয়েছে। বিশালক্ষ্মী দেবীর নাম গান করতে করতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। দৃশ্য হলো অপরূপ। বালক গদাধর গান করতে করতে হঠাৎ নেমে গেলেন। নিথর, নিশ্চল। সাড়া নেই, শব্দ নেই। ধ্যানে তন্ময়। ভাবে বিভোর। চোখে শ্রাবণের জলধারা। সহযাত্রীরা স্তম্ভিত। ভীত। কেউ বলেন রোদের তাপে গদাধর হয়েছে অস্থির, কিম্বা সর্দিগর্মী হয়েছে। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সহযাত্রীরা। তাঁরা দ্রুতপদে তাড়াতাড়ি করে সামনের পুকুর থেকে নিয়ে এলেন জল, গদাধরের চোখে মুখে জল দিলেন ছিটিয়ে। পাখার বাতাস দিলেন। কিন্তু গদাধর আর নেই তার নিজের মধ্যে। নাম করতে করতে তিনি চলে গিয়েছেন নামময় জগতে। ভীত, স্তম্ভিত যাত্রীরা। এখন কি হবে তাঁদের? শ্যামল গদাধরকে কেমন করে নিয়ে যাবেন তাঁরা? কি করে হবে দেবীর মানত? সকলের কণ্ঠে আকুলতা। গদাধরকে ডাকছেন কিন্তু আর কোন সাড়া নেই।

প্রসন্নময়ী তখন ভুলে গেলেন সব।

গদাধর নিথর। নীরব। ভাবে বিভোর। বালক গদাধরকে সামনে রেখে প্রসন্নময়ী ব্যাকুলভাবে বিশালক্ষ্মীর নামগান করতে লাগলেন। অন্তরের দেবতা জেগে উঠলেন বুঝি। প্রসন্নময়ীর অন্তরের প্রার্থনা মুখর হয়ে উঠলো, কাতরভাবে বলে উঠলেন প্রসন্নময়ী ; "মা বিশালক্ষ্মী, প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর ; মা বিশালক্ষ্মী, মুখ তুলে চাও মা, অকূলে কূল দাও।"

দেবীর নামে জেগে উঠলেন গদাধর। মধুর হাস্যে ভুলিয়ে দিলেন সবাইকে।

সহযাত্রীরা হলেন নিশ্চিন্ত। গদাধরের দেহে দেবী এসেছিলেন স্বয়ং। আহা এমন ভুবন ভোলানো শ্যামল গদাধর। প্রসন্নময়ী ও আর সকলে দেবীর বন্দনায় মুখর হয়ে উঠলেন।

খবরটা যখন জননী চন্দ্রাদেবীর কাছে গেলো, তখন জননী ভাবলেন গদাধরকে চোখে চোখে রাখতে হবে। নয়নের নিধি কি জানি কখন কি ঘটে?

পুত্রের মঙ্গল কামনায় কুলদেবতা রঘুবীরের বিশেষ পূজার আয়োজন করলেন আর সেই সঙ্গে বিশালক্ষ্মীরও পূজা করলেন?

এমনি করেই গদাধরেব বাল্যকাল এগিয়ে চলে। ভাব জগতের খেয়াল খুশীতে চিত্র গড়ে ওঠে বিচিত্র ভাবে: 'যখন যেখানে যেমন, ঠিক সেখানে তেমন' এই উক্তিটা তাঁর জীবনালোকে বিস্মিতভাবে গড়ে ওঠে।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের ওপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আসে। গদাধরের বয়স সাত। বালক গদাধরের মনে তখন স্নেহময় পিতার চিন্তা। জননী চন্দ্রা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রাখেন। স্নেহময়ী জননীর দুঃখের কথা বুঝলেন গদাধর। দিন চলে। বালক গদাধর কি যেন ভেবেই চলেছেন। মায়ের মন কেঁদে ওঠে। মনে মনে প্রার্থনা। দেবতার মন্দিরে মন্দিরে তার নাম গান। জননী চন্দ্রা দেখেন, আর মন তাঁর ভরে ওঠে গর্বে, শ্যামল গদাধর হাস্য সুধায় মায়ের মন দেন ভরিয়ে।

দেখতে দেখতে গদাধর ন' বছরে পা দিলেন।

এলো শুভদিন। উপনয়ন হবে এবার। রামকুমার আয়োজন করলেন। এই উপনয়নে বালক গদাধরের জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

উপনয়নকালে বালক গদাধর আত্মীয় স্বজন ও সমাজ প্রচলিত প্রথাকে পালটে দিলেন।

নবীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয় উপনয়নের পরেই। মায়ের চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কে আছেন?

কিন্তু গদাধর তাঁর ধাইমা 'ধনি'কে ভালবাসতেন অসীম। ধাইমা ধনির অনুরোধ প্রথম ভিক্ষা যেন সেই পায়। এতদিন তারই প্রতীক্ষা। সাগ্রহে আছেন 'ধনি' ধাইমা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বালক গদাধর। প্রতিজ্ঞাও। কিন্তু গদাধরের এই পাগলামী? বোঝালেন সবাই। দেশাচার' কুলাচারকে সামনে রেখে গদাধরকে বললেন, "এসব করো না। তুমি এখন দ্বিজ! শ্রেষ্ঠ!" কিন্তু কে কার কথা শোনে? অন্তরে যার কাছে ভালো, যাকে সে দিয়েছে ভালবাসা প্রীতি। যার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাকে কেমন করে দূরে সরিয়ে দেবে?

অটল, স্থির গদাধর। পরাজয় ঘটল সকলের। সবার কাছে বললেন গদাধর; প্রথম ভিক্ষা সে চেয়ে নেবে ধনির কাছ থেকে।

এমন করে বালক ধনির স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাকেই দিলেন ভিক্ষা-মাতার আসন।

বালক গদাধর এগিয়ে চলেছেন সময়, কাল, স্থিতিকে কোলে করে। কামারপুকুর হয়ে ওঠে তীর্থভূমি। পাঠশালায় তাঁর মন নেই আর। কি হবে লেখাপড়া শিখে? যাত্রাগান, সঙ্গীত, পুরাণ কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাও, এর চেয়ে ঢের ভালো। আনন্দময় জগতে আনন্দ করে যাও, সংসার দু'দিন বইতো নয়। বালক গদাধরের আরেক নাম দিলেন তাঁর সাথীরা, বললে, "নটের রাজা।" নটের রাজা গদাধর। খেলার রাজা, গানের রাজা, সবার রাজা গদাধর।

এমন করে এগিয়ে চলে দিন।

গদাধর এখন তেরো বছরে পা দিলেন।

ইতিমধ্যে সংসারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রামকুমারের স্ত্রীর মৃত্যুতে সংসারে নেমে এসেছে কালোছায়া। রামকুমারের শিশুপুত্র অক্ষয়কে নিয়ে কাঁদেন জননী চন্দ্রা। রামকুমারের মনের চিন্তা, কি করে সংসার চালাবেন? স্ত্রীর মৃত্যুর পর যেন সবই বদলে গেছে। অভাব আর অনটনে চলেছে সংসার। অনেক ভেবে রামকুমার কলকাতায় যাবেন ঠিক করলেন। উদ্দেশ্য একটা টোল খুলবেন। সেই আশায় কলকাতার দিকে রওনা হলেন। কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে এক টোল খুললেন।

কামারপুকুরে জননী চন্দ্রা। মধ্যম ভাই রামেশ্বর। রামেশ্বর ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির লোক। গদাধর পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আর

সেই অবসরে গদাধর নিজের ধ্যানে নিজে ডুবে যেতেন। তাঁর ললিত কণ্ঠের শ্যামা সংগীত মধুর হয়ে ঝরে পড়ত। সেই সময়েরই ঘটনায় দেখা গেছে, গদাধরের গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন পাঠশালার গুরুমশাই। বালক গদাধরকে শাস্তি দিতে এসে নিজেই শাস্তি নিয়ে ফিরে গেছেন।

গদাধর ছিলেন অপরূপ ভাবুক ও ধ্যানপরায়ণ, আবার ছিলেন অনুরাগে পরিপূর্ণ রঙ্গরস প্রিয়। গদাধর আশ্চর্য করে দিতেন, যখন অপরের ভাবভঙ্গী, কণ্ঠস্বরকে নকল করে দিতেন। বিশেষ করে মেয়েদের হাবভাব বেশভূষা।

কামারপুকুর গ্রামের দুর্গাদাস পাইন ছিলেন মেয়েদের কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী। দুর্গাদাস বলতেন : আমার অন্দর মহলে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নেই। সেই গ্রামেরই সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে গদাধরের ছিল অবাধ মেলা-মেশা। সে বাড়ীর সকলেই গদাধরকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। দুর্গাবাবু এ সব ভালো বাসতেন না। গদাধর মনে মনে ভাবতেন, বৃদ্ধ দুর্গাদাসবাবুর অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে হবে।

কথা প্রসঙ্গে গদাধর বললেন : আমি ইচ্ছে করলে আপনার বাড়ীতে যেতে পারি এবং মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে আসতে পারি।

কেমন করে ?

গদাধর বললেন সে পরে জানতে পারবেন।

তারপর করলেন কি গদাধর এক অপরূপ বেশে নিজেকে সাজালেন। হলেন তাঁতি বৌ। অসহায় হয়ে পড়েছে তাঁতি বৌ। কামারপুকুরে এসেছিল হাটে সুতো বেচতে। সঙ্গের সাথীরা পালিয়ে গেছে। এখন উপায় ? এই অন্ধকারে যাই কেমন করে ?

তাঁতি বৌ-এর কথা শুনে দুর্গাদাস বাবু দিলেন আশ্রয়। বাড়ীর মেয়েরা তাঁতি বৌকে দেখে খুশী হয়ে আদর করে বসালেন।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে এখনও ফিরে আসেননি বাড়ীতে গদাধর। মায়ের মন মানে না। ভাইয়ের খোঁজে চলে আসেন রামেশ্বর। খোঁজ খোঁজ। অন্ধকারে সে ডাক এসে কানে যায় গদাধরের। গদাধরের তখন আরেক রূপ। মুহূর্তের মাঝে আরেক রহস্য, তাঁতি বৌ তার ঘোমটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে গেলেন। হতবাক সবাই। মেয়েরা হাসলেন, আর দুর্গাদাসবাবু তিনিও হাসিতে যোগ দিলেন।

রূপ আর রঙ, অভিনয় আর সংগীত, খেলা, আর পথ চলা এই হল গদাধরের নিত্য সংগী। শিল্পী গদাধর সেও পরম বিস্ময়। কিশোর বয়সে নিজেই গড়ে তোলেন মূর্তি। দেবী প্রতিমা। এমন সজীব। স্তম্ভিত কুমার আর পটুয়ারা।

হার মেনে নেয় অভিজ্ঞ কারিগররা। মূর্তি গঠনে শিল্পী গদাধর ছিলেন এক অদ্বিতীয় শিল্পী। এমনি করেই কিশোর বয়সে গদাধর তাঁর লীলাভূমিতে বিচরণ করেন। সে কখন অভিনেতা হয়, পরিচালক ও যাত্রায় অভিনয় করেন, বালকদের শেখান। পাঠাশালার দ্বার তার বন্ধ। এখন সে স্বাধীন। মুক্ত। অবাধ তার চলার গতি।

এমনি করেই দিন চলে। আনন্দময় হয়ে ওঠেন গদাধর।

কলকাতা থেকে এলেন রামকুমার, বুঝলেন গদাধরকে এবার নিয়ে যাওয়া দরকার।

দাদার সঙ্গে চলে আসেন গদাধর কলকাতায়।

গদাধর চলেছেন কলকাতায়। কামারপুকুরের আনন্দের হর্ষ-বিষাদ হয়ে গেল। সতের বছর ধরে এই কামারপুকুর তীর্থ হয়েছিল। সাথীরা কাঁদেন—জননী কাঁদেন—পথ চেয়ে দেখেন গ্রামবাসীরা, শ্যামল গদাধর চলেছেন কলকাতায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভ দিনে।

কলকাতা এলেন গদাধর।

লেখাপড়া শেখবার জন্য নিয়ে এসেছেন রামকুমার। সহজ করেই জানালেন গদাধর, চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাইনে, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই, যাতে জ্ঞানের উদয় হয় মানুষের মনে।

সতের বছরের গদাধর স্পষ্ট করেই তাঁর পথের নির্দেশ দিলেন। এমন পথ, যে পথে মহৎ হয়ে উঠবে জীবনের শতদল।

সবাই তো জানা তবুও অচেনা। গদাধর এলেন আপন লীলাভূমিতে।

দাদার টোলেই গদাধর তার জায়গা করে নিলেন।

এখানে এসে গদাধর কামারপুকুরের মত আপন করে নিলেন এখানকার লোকদের। দেবজ্যোতির কিরণ-ছটায় বিকশিত হয়ে গদাধর পূর্ণ হয়ে উঠলেন রূপে। ঝামাপুকুরের পাড়ায় পাড়ায় কল-গুঞ্জন। রমণীদের মধ্যে তাঁর ডাক এলো। প্রিয় হয়ে উঠলেন গদাধর।

দেবসেবা করেন পাড়ার ঘরে ঘরে।

কামারপুকুরের মতন এখানেও গদাধর নিজের দলকে চিনে ফেললেন।

রামকুমার ভাবলেন, যাকে নিয়ে এলাম কলকাতায় সে যদি ঠিক তেমনি থাকে, তাহলে এ আনার কি দাম? যদিও বুঝলেন তিরস্কার করে কোন লাভ নেই, তবুও সংসার চলবে কি করে?

আনন্দের মধ্যে গদাধর দিন চলে যায়—।

রামকুমার বুঝিয়ে বললেন।

গদাধর খুলে বললেন, কি তার পথ। কেমন ভাবে গেলে সে নিজেকে চালাতে পারবে? অর্থ উপায় করে কি লাভ, সেদিকে আমার লক্ষ্য নয়, আমার লক্ষ্য শুভঙ্করী জ্ঞান!

রামকুমার বুঝলেন। বুঝলেন গদাধর এসেছে শিখতে নয় শেখাতে।

সরল, উদার রামকুমার। মনের আয়নায় নিজেই বিচার করেন তবুও অনিবার্য সংঘাত। সংসার চলে না। এখানকার টোলের অবস্থাও ভালো নয়, যে কোন অবস্থায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একটা অন্য কিছু করা দরকার, এই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে রামকুমার প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

আর গদাধর!

এখানে এসে আনন্দের হাটে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। সরল, আত্মহারা গদাধর—মধুর ভজন সংগীতে সকলের মনে ভালবাসার ছায়া মেলে দিলেন। দেখতে দেখতে ঝামাপুকুরের পাড়ায় তাঁর অনেক সঙ্গী জুটে গেল। গদাধর সহজেই তাদের সঙ্গে খেলাধূলা, গান-বাজনার মধ্যে মেতে উঠলেন।

দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল।

এই দু'বছরের মধ্যে গদাধর নিশ্চিন্ত হয়েই তাঁর পথের দিকে পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত হলেন। রামকুমার ভাবছিলেন পথ কোথায়? কিভাবে গেলে আবার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ফিরে আসতে পারে।

দ্বৈত মনের এতটা বিরোধ যখন, তখন রামকুমারের ডাক এলো রাণী রাসমণির কাছ থেকে।

রাণী রাসমণি, দয়াবতী, ধর্মমতী, পুণ্যশীলা মহিয়সী নারী। ইতিহাসের পাতায় রাণী রাসমণির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রাণী রাসমণি ছিলেন মা কালীর সেবিকা। তিনিই দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তীর্থ যাত্রার আগে রাণী রাসমণি স্বপ্ন দেখলেন, দেবী স্বয়ং তাকে বলেছেন, "কাশী যাবার আর দরকার কি? গঙ্গাতীরে মন্দির তৈরী করে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, আমি তোর পূজা গ্রহণ করব।"

তীর্থযাত্রা আর হল না। রাণী রাসমণি ভাবলেন কি করে তাঁর স্বপ্নকে সফল করবেন? দিন এগিয়ে আসে—তাঁর মন চিন্তায় ভরে ওঠে। পণ্ডিতরা তাঁর আশাকে ব্যর্থ করে দিলেন। নীচু জাতির ভোগ জগদম্বা গ্রহণ

করেন না। কাজেই তোমার আশা পূর্ণ হবে না।

রাণী রাসমণির অন্তর কেঁদে উঠলো। তবে কি তাঁর সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে? দীনতম বলে কি সে পূজার প্রসাদ পাবে না। মায়ের পূজা কি বিফলে যাবে?

সংশয় আর সন্দেহ নিয়ে রাণী রাসমণি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আশার আলোর বাণী খুঁজে পান।

ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠি থেকে রামকুমার লিখে জানালেন যদি "রাণী রাসমণি মন্দির কোন ব্রাহ্মণের নামে দান করেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তিও ঐরূপভাবে ন্যস্ত করেন, তবে সকল দিক দিয়া রাস্তা পাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে ঐ মন্দিরে পূজকের কাজ করিয়া, কিংবা ওখানে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও কোন ব্রাহ্মণের পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।" (শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত)

রাণীর অন্তরে আলো এলো। রামকুমারের বিধান তিনি মেনে নিলেন। তবুও কেউ পূজার ভার নিতে চান না।

নিরুপায় হয়ে রাণী আবার রামকুমারের শরণাপন্ন হলেন।

রামকুমার দেখলেন ভক্তিমতী রাণীর সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হতে চলেছে। বিধান দিয়েছেন রামকুমার। এ কাজ তাঁকেই করতে হবে।

রামকুমার নিলেন দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠা হল মায়ের মন্দির।

রামকুমার প্রতিষ্ঠা দিনের পূজারীর আসন নিলেন।

তারপর রাণীর অনুরোধে নিত্যসেবার ভার নিলেন রামকুমার।

রামকুমার ভার নিয়েছেন, কিন্তু গদাধর তার মনকে প্রবোধ দিতে পারলেন না। বললেন অগ্রজকে, এ পথ থেকে সরে এস নিজের পথ দেখো।

রামকুমার বোঝালেন। শাস্ত্র বিধানে গদাধর শান্ত হলেন।

কিন্তু দেবীর প্রসাদ গদাধর খেলেন না।

মহাকালের ডাকে গদাধর এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

এলেন নানা সংশয় নিয়ে।

নিজের হাতে রান্না করে খান।

গঙ্গার তীরে একা একা থাকেন।

দক্ষিণেশ্বর—

সর্বতীর্থের মহামিলনের তীর্থভূমি। পথহারা পথিকের চলার নিশানা—।

সুদেবতা পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার তীর্থভূমি। ইতিহাস বহন করেছে নব জাগরণের গানের যজ্ঞশালার বিরাট বিপ্লব। অন্তহীন, কালহীন, ঘোর অমানিশার রাত্রির আসন্ন শুভ্র প্রভাতে বয়ে চলেছে কলকল্লোল সংগীত। আসমুদ্র হিমাচল নেমে এসেছে ভাগীরথীর কলতানের কণ্ঠে। কে জানতো, সেদিনের পাগল গদাধর ভাবী যুগের স্বয়ং নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে এসেছেন ধরণীর ধুলায়: যাঁর চরণতলে বর্ণিত হয়েছে যুগসাধনার ইতিহাস।

সেই অতীত অন্ধকার থেকে আলোর বর্তিকা নিয়ে এসেছেন শ্যামল গদাধর। কামারপুকুর গ্রামের গদাধর তখনো শ্রীরামকৃষ্ণরূপে পরিচিত হননি।

সংশয় মন নিয়ে এখানে গদাধর এলেন।

মনের সংশয় কেটে গেল।

এলেন যেন আরেক জগতে।

ভাগনে হৃদয় এসেছে—দক্ষিণেশ্বরে। গদাধরের সমবয়সী। হিসেবী হৃদয়, সংসারী। তবুও দু'জনের মধ্যে ভালবাসা ছিল প্রবল। হৃদয় আসতে, গদাধর মুগ্ধ হলেন। নির্জন এই দক্ষিণেশ্বরে একা ছিলেন, এবার সঙ্গী পেলেন গদাধর।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সাধক জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন! হৃদু কাছে না থাকলে আমার কি যে অবস্থা হতো তা আর বলা যায় না···হয়ত আমার শরীর টিকত না।

দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়ের আগমণে গদাধরের প্রাণে খুশীর হাওয়া। নিঃসঙ্গ জীবনে আরেকজন সংগী—।

শিবমূর্তি তৈরী করেছেন গদাধর। শিল্পী গদাধর। পূজা করবেন। কামারপুকুরেও করতেন এরকম মাঝে মাঝে।

ভাবে, আবেগে বিভোর গদাধর।

পুজো করছেন নিজেই।

এমন সময় মথুরবাবু যাচ্ছিলেন এ পথ দিয়ে। ভাবুক শিল্পী গদাধর তখনো নিজের ভাব জগতে।

মথুরবাবু অপলকদৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন কি সুন্দর?

কে এই শিল্পী?

কোন নিপুণ তুলির স্পর্শে সে সজীব।

গদাধর করেছে।—বিস্ময়ে মথুরবাবু চমকে উঠলেন।

ভাগনে হৃদয় গদাধরের কাছে কাছে। মথুরবাবু পুজো শেষ হলে মূর্তিটি চেয়ে নিলেন।

দেখলেন রাণী রাসমণি।

দেখলেন এক আপনভোলা মহেশ্বরকে। দু'চোখে অশ্রুপ্লাবিত রাণী রাসমণি, বিস্ময়ে মুগ্ধ তিনি।

মথুরবাবুর মন চাইছে গদাধরকে আরও কাছে পেতে। দূর থেকে দেখেই তাঁর তৃপ্তি নেই। মথুরবাবুর গভীর শ্রদ্ধা গদাধরের প্রতি।

তাঁর চোখে জেগে ওঠে গদাধরের অপরূপ মূর্তি, যেন স্বয়ং ভগবানই লীলা ছলে মনুষ্যরূপে এসেছেন এ ধরায়। কিন্তু ধরা দেবে কে? ভক্তের ডাকে ভগবান। না ভগবানের ডাকে ভক্ত?

একদিন মথুরবাবু দেখলেন একসংগে দু'জনকে। ভাগনে আর মামা হৃদয় আর গদাধরকে। মথুরবাবু ডাকলেন তাদের।

কিন্তু গদাধর যেতে রাজী নয়। বলেন। গিয়ে কি লাভ? সেই চাকরী? আমার দ্বারা তা হবে না।

নিশ্চিন্ত মনে বলেন গদাধর।

হৃদয় বললে, তাতে দোষ কি? একটা কিছু করা দরকার। তাছাড়া রাণী রাসমণি, মথুরবাবু, এঁরা লোক ভাল। গঙ্গার তীরে দেবস্থান।

হৃদয়ের কথায় নির্ভরতা। যুক্তি। কিন্তু গদাধর বললেন: চিরকাল কেনা হয়ে থাকতে হবে আমাকে? তার ওপর দেবীকে সাজাতে হবে, তার সংগে থাকতে হবে। না।

গদাধরের কথা শুনে হৃদয় সাহস দিয়ে বললেন, কেন পারবে না?

গদাধর শান্তকণ্ঠে বললেন, বেশ আমি রাজী। কিন্তু একটা সর্তে –।

হৃদয় অনুমান করলে, বললে: আমি থাকবো তোমার পাশে পাশে। তোমায় সাহায্য করবো।

গদাধর রাজী হলেন।

আর হৃদয়, খুশী হয়ে উঠলেন, একটা কিছু করবার জন্যেই তো তার এখানে আসা।

গদাধর বেশকারীর পদে নিযুক্ত হলেন। সঙ্গে রইলো হৃদয়রাম।

রামকুমার আর গদাধরকে সাহায্য করতে লাগলেন ভাগনে হৃদয়।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল—।

একদিন রাধাগোবিন্দজীর মূর্তির পা গেল ভেঙে।

আর গদাধর সেই ভাঙা মূর্তির পা জুড়লেন এমন করে যে কেউই বুঝতে পারলে না যে পা জোড়া হয়েছে।

নানা জনের নানা কথা। কেউ কেউ বলেন গদাধর পাগল। হাসেন গদাধর। ভাব সমাধির তীরে।

গদাধরের কাছে এলেন মথুরবাবু।

গদাধর ভাবে আবিষ্ট। ডুবে গেছে ধ্যানের সাগরে।

বিধান দিলেন গদাধর: আর দরকার কি? মূর্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

তবুও সংশয়।

গদাধর বললেন: রাণীর জামাতার যদি পা ভেঙে যেত, তবে কি তাঁকে ত্যাগ করতেন রাণী? না চিকিৎসা করে সারাতেন?

মথুরবাবু দিব্যদৃষ্টি পেলেন। রাণী রাসমণিও। তাঁরা ভাবলেন ঠিকই বলেছেন গদাধর।

শিল্পী গদাধর আবার নতুন করে এগিয়ে গেলেন আরেক মধুর জগতে—।

আপনার সাধনায় মগ্ন গদাধর। পূজা করতে করতে নিজেই কেঁদে ওঠেন, কখনো হাসেন। কলকল্লোলিনী প্রবাহিনী ভাগীরথীর তরঙ্গধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঘোর ঘন অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে নগণ্য বেশে গদাধর সাধনার ধ্যানে মগ্ন। জগতের কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। জীবন সমুদ্রে ভেসে চলেছেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে। শ্যামল ঘনকৃষ্ণ সহাস্যময় গদাধর দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো ভেসে চলেছেন জীবন নদীর স্রোতে—।

স্মরণের দৃষ্টি নিয়ে তাকাই।

গদাধরের দু'চোখে অশ্রুর ধারা। তাঁর কণ্ঠে মধুর সংগীত, জগতের সমস্ত ভাবনা থেকে তার এক মধুর জগতের সন্ধানে মগ্ন। কে জানে কি বিরাট শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন যুগের নারায়ণ? গদাধর তন্ময় হয়ে গান গাইছেন। প্রাণের উল্লাসে মধুর হয়ে উঠেছেন—! রাণী রাসমণি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। গানের সুর ভেসে উঠে গদাধরের। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সন্তানের ডাকে মা চলে এসেছেন তার কাছে। মা-মা বলে ডাক। প্রাণভরে ডাক।

রাণী রাসমণি শুনতেন দক্ষিণেশ্বরে এলেই গদাধরের কণ্ঠে অপূর্ব সে গান।

গদাধর গান গাইছেন :

কোন হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে।
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড)

গান গাইতে গাইতে গদাধরের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। তন্ময় হয়ে যেতো পূজার সময়ে।

গদাধর কখনো নির্জন গঙ্গাতীরে বসে আছেন। কখনো পঞ্চবটিতে ´কখনো একা একা পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রামকুমার গদাধরের এই ভাবময়তায় চিন্তিত হলেন, তাঁর ধারণা হলো যে, কামারপুকুরের দিকে গদাধরের মন চলে গিয়েছে—।

পরে যখন দেখলেন গদাধর এখন বেশকারীর পদ নিয়ে ছ মন দিয়েছে কাজে। রামকুমার নিশ্চিন্ত হলেন।

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন গদাধর।

দীক্ষাগুরু' কেনারাম ভট্টাচার্য প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন গদাধরকে।

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

কালের কল্লোলে জীর্ণ হয়ে গেলেন রামকুমার। অসুস্থ শরীরে কোন কাজ করতে পারেন না রামকুমার।

গদাধরের ওপর ভার এলো দেবী পূজার। হৃদয়রাম ভার নিলেন রাধা গোবিন্দজীর সেবা করবার—।

দক্ষিণেশ্বরের কালী প্রতিষ্ঠার পর মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন রামকুমার।

মরণের ডাক এসেছে—

কর্মজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রামকুমার চলে গেলেন অমর লোকে।

পিতার মৃত্যুর পর, আবার নতুন করে শোক পেলেন গদাধর। স্নেহময় দাদা রামকুমারের ছায়ায় এতদিন নিজেকে ডানা মেলে দিয়েছিলেন।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর যেন আরেক নতুন জগতের সন্ধানে চলে গেলেন। এ সংসার অনিত্য! সব কিছুই মিথ্যা! বৈরাগ্যের আগুনে জ্বলে

গেলেন গদাধর। ধ্রুব আর চিরন্তন সত্য নিয়ে আরও গভীরভাবে নিজেকে নিবেদন করলেন দেবীপূজায়।

মাকে দেখা চাই-ই।

একই রূপে আরেক রূপ।

এগিয়ে এলেন পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ। পেছনে রয়ে গেল তাঁর কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি, যে স্মৃতিতে ভাবমগ্ন গদাধর--আজ সে ভক্ত রামকৃষ্ণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ হয়ে এগিয়ে এলেন।

জীবনের নিশানা খুঁজে পেলেন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশ্বজননীর সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পঞ্চবটী, ঘন জঙ্গলে ঘেরা—।

ধ্যানমগ্নতায় বিলীন শ্রীরামকৃষ্ণ! তাঁর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হয়েছেন তিনি।

এখন শুধু ভাব সমাধি।

শংকিত হৃদয়, তাঁর মনে আশঙ্কা, মামার এই অবস্থা হলে শেষ পর্যন্ত কী যে হবে তাই বা কে জানে?

কিন্তু ঠাকুর? না, জানেন না কিছুই। আপন মনে আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করছেন। চারদিকে বন আর জঙ্গলে ঘেরা। রাত্রি নীরব আর সেই নীরব নিথর রাত্রিতে ঠাকুর একাই চলে আসেন।

ঠাকুর ধ্যানে নিমগ্ন, আচ্ছন্ন। একইভাবে। রোজই।

হৃদয় ভাবলেন, ফিরিয়ে আনতে হবে। ভয় দেখালেন মামাকে। ছুঁড়লেন ঢিল। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। আপন সাধনায় মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধনায় সাধক তিনি।

হৃদয় শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারলেন না। পিছু পিছু ধাওয়া করলেন।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরকে দেখলেন।

একেবারে মুক্ত। একটা বসন নাই গায়ে। পৈতে পর্যন্ত গলায় নেই। ধ্যানে বিলীন!

অবাক হয়ে বললেন হৃদয়, একি মামা, একেবারে উলঙ্গ হয়ে বসেছ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও বিভোর। নামে তন্ময়, ধ্যানে মগ্ন। হৃদয় ডাকলেন, বার বার! হৃদয়ের ডাকে জেগে উঠলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন: ধ্যান করতে গেলে তার মধ্যে ডুবে যেতে হয়। ডুবতে ডুবতে একেবারে মিশে যেতে হয়, না হলে ধ্যান করে লাভ কি?

এইভাবে নিজেকে মুক্ত করে ধ্যান করতে হয়, জন্ম থেকেই মানুষ অষ্ট পাশে নিজেকে বেঁধে রাখে। ঘৃণা, লজ্জা, কুলশীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান তাকে ঘিরে রেখেছে, মাকে ডাকতে গেলে তার কাছে নিঃস্ব হয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হয়। মায়ের কাছে ছেলে চিরদিন শিশু, মায়ের কোলেই তার বড় সম্পদ—।

হৃদয়ের দিব্যদৃষ্টিতে প্রসন্নতা দেখা দিল। এ ধরণের কথা কোন দিনই তাঁর কানে আসেনি। মামাকে তিরস্কার করা তো দূরের কথা একটা ভাব মগ্ন অবস্থায় হৃদয় ফিরে গিয়েছিলেন তখন।

সাধনায়, প্রার্থনায় মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ভুলে গেলেন কে তিনি? নানা দিব্য-দর্শনে নিজেকে বিভোর করে রাখেন। স্মরণের দৃষ্টি নিয়ে তাকাই, দেখি পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই ভুবন ভোলানো রূপের মাধুর্য। সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘন অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে দামাল ছেলে ভাগীরথীর তরঙ্গ উত্তালের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন। কখনো কাঁদেন, কখনো হাসেন। আবেগে, ভাবে বিভোর রঙে রসে নিজেই বিভোর। দিনের পর দিন চলে যায়, কিন্তু বিরাম নেই। সেই আকুল আকুতি, কেঁদে ওঠেন যুগশ্রেষ্ঠ, বলেন দে-দে মা, মাগো দেখা দে, দিন যে চলে গেলো—।

এ কান্নার বিরাম নেই, নিশীথ রাত্রিকেও ভেদ করে আসে সেই মর্মস্পর্শী আবেগময় মধুর ডাক।

তবুও সে ডাকের বিরাম নেই—। সবাই বলে পাগল। উপহাস ভরা সকলের কথা। কিন্তু কে কি বলছে তার দিকে লক্ষ্য নেই সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের। সাধনার পথে এসে আজ তিনি দেউলিয়া। নিত্যকালের আনাগোনায় মুখরিত কালীবাড়ী। মায়ের কাছে ঠাকুরের আকুতি মিনতি, শুধু দেখা দে মা, দেখা দে।

ভাবের হাটে এসেও ভবতারিণীর দেখা পায়না ঠাকুর।

নিশ্চল আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর সাধনায় মগ্ন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ—। মন্দিরে পূজো করতে গিয়ে ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে ওঠেন যুগশ্রেষ্ঠ, তাঁর কণ্ঠে এক মন্ত্র,—

দেখা দে।

চোখের জলে ভিজে যায় সব।

কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত অবসন্ন হন ঠাকুর—মায়ের দর্শন না পেলে এ জীবনের কি দাম? আকুল ক্রন্দনের বিরাম নেই।

আরতি করতে করতে ঘণ্টাধ্বনি আর থামে না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়—অনন্তের আরতি লীলা চলে—আর যে দেখে সেই বলে—

'হয়েছে উন্মাদ'।

ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠেন ভাগনে হৃদয়।

স্মরণের দৃষ্টি পথে উধাও হই, সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সাধন লীলা।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুলকণ্ঠে বলছেন: 'মাগো মা, তুইতো রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস তবে কেন আমায় তুই দেখা দিবি না?—আমি ধন, জন, ভোগ সুখ কিছু চাইনে—শুধু তোর দেখা চাই-ই।

আকুল আর্তনাদে কেঁদে ওঠেন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। একমনে চেয়ে আছেন দেবীর দিকে। নিথর। নিশ্চল সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। দিন নেই, রাত নেই, শুধু একই চিন্তা, কখন দেখা পাবেন দেবীর? দুর্লভ দর্শনে ব্যাকুল তাঁর অন্তর। অন্তরে আরতি চলে। অনুরাগে প্লাবন তাঁর মন ও দেহ। ধ্যানে মগ্ন। দিনদিন একই ঘটনায় সাজানো ছবি।

কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন।

আবার কখনো একেবারে চুপ।

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। হাতের ফুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মায়ের প্রসাদ তুলে নেন মুখে। বিলাপে বিভোর হল নিজে।

ভাগনে হৃদয় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

মথুরবাবু বিস্মিত। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন—

রাণী রাসমণিকে বললেন,—

'আশ্চর্য পূজারী পাওয়া গেছে, এবার দেবী জাগ্রতা হবেন।'

এগিয়ে চলে কাল।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণও এগিয়ে আসেন আরেক ভাব মধুর জগতে। ব্যাকুলতায়, আকুলতায় মগ্ন তিনি।

খাওয়া ঘুম তাঁর নেই। সব ছেড়ে দিয়েছেন।

নানা দিব্য দর্শন তাঁর দেহে ও মনে। বক্ষ রক্তিম, চোখেতে শ্রাবণের

যারা, মুখে গভীর রহস্যতা। আর কণ্ঠে আকুলতা কেমন করে দেখা পাব।

ঠাকুর বলতেন: "মা এত যে ডাকছি তার কিছুই কি তুই শুনছিস না?"

তবুও মায়ের দর্শন না পেয়ে সাধক ভাবলেন, সব ভুল, সব মিথ্যা—। তবে কি মা নেই? গানের মধ্য দিয়েও মায়ের সাড়া পাওয়া গেল না। তবে এ জীবনের কি দাম? সব ব্যর্থ—তা হলে, মা নেই? নিজেকে আত্মঘাতী করে প্রাণ দেবেন ঠাকুর! এই কঠোর সংকল্প নিয়ে মার হাতের অসি নিয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত হলেন। আশ্চর্য, একটা অদ্ভুত পরিবেশে ফিরে গেলেন ঠাকুর। একদিকে মাকে না দেখার যন্ত্রণা, অন্যদিকে হৃদয়ের যন্ত্রণা।

সেই সংকটকালে ঠাকুরের মনে হলো যেন এক আশ্চর্য অনুভূতি। এক আশ্চর্য আলোর শিখা স্পর্শে চমকে উঠলেন ঠাকুর, দেখলেন জ্যোতির্ময়ী মাকে। মা দেখা দিলেন। তারপর ঠাকুর বলেছেন নিজেই এক অপূর্ব দর্শনের অনুভূতির কথা।

"ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল, কোন কিছুরই চিহ্ন নেই। আর দেখা যাচ্ছে অসীম আলোকে জ্যোতির সমুদ্র—আর যতদূর চাইছি শুধু আলোকের ঢেউ. জ্যোতির তেজে আমায় সে গ্রাস করলে, আমি ডুবে গেলাম। তলিয়ে গেলাম, আমার কোন চেতনা রইল না।"

জ্ঞান ফিরে পাবার পর ঠাকুর আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠলেন 'মা' 'মা' বলে। তারপর আবার ভাবাবেগ। হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণায় সাধক মুখর হয়ে উঠলেন মৌনতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলেন জীবন বেদের মন্ত্রে।

কিন্তু এ দর্শন দিয়েই আবার কেন চলে গেলি মা? তোর দেখা কি পাব না মা? বল? একবার—শুধু একবার দেখা দে মা? আকুল করা ডাকে তো কই তৃপ্তি মেটে না। বার বার দেখতে চাই আমি?

এগিয়ে যাই।

কল্পনায় আমি পরমপুরুষের অমৃত জীবন সন্ধানের পরিক্রময় দিনলিপির পাতাগুলিতে, কালের ইতিহাসে যা অমর। ঠাকুর বলেছেন: মা আমায় দেখা দে মা। আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে মা, যাতে আমার দেহ মন শুদ্ধ হয়।

কাতর যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুর। ভাগনে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠেন। দেখছেন সব। কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। আর ভাবময় ঠাকুর মার দর্শনে আত্মহারা। পড়ে রইল পূজা আর আরতি।

ভাগনে হৃদয় খবর পাঠালেন কামারপুকুরে। হৃদয়রাম অস্থির হয়ে গেলেন, পূজা বন্ধ দেখে অন্য একজন পূজারীকে দিয়ে পূজা করালেন।

আবার যেদিন চেতনা থাকত ঠাকুরের, বসতেন পূজোয়। তখনকার সময়ে বলতেন ঠাকুর "মন্দিরের ছাদের ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্তি আছে। মনকে দেখতাম ঠিক এইভাবেই স্থির হয়ে মার পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করতে হবে—মায়ের রূপে বিভোর হয়ে দেখলাম জ্যোতি মহাসমুদ্রে মা—কি দেখছি—কি বুঝেছি তা জানিনে, মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝিনে, তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে, যা করলে তোকে পাওয়া যায় তাই তুই কর, আমায় শিখিয়ে দে।"

কান্নায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ।

অদ্ভুতভাবে তন্ময় শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়।

সরলতায়, নিষ্ঠায় ধ্যানমগ্ন সাধক তিনি।

লক্ষ্য তাঁর মাকে। মায়ের মন্ত্রে তিনি মুখর। শুধু অহরহ এক চিন্তা, আমি তোর কাছে শরণাগত তুই যা বলবি তাই করব আমি।

আনন্দঘন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব জগতের বাইরে! ভাগনে হৃদয় দেখলেন। ঠাকুর যেন আর নিজের মধ্যে নেই।

মাতালের মত তাঁর সমস্ত রূপ।—

কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন।

কখনো টলতে টলতে পূজার আসন ত্যাগ করে সিংহাসনের ওপর উঠে সস্নেহ ছোট মেয়ের মত আদর করছেন।

আবার কখনো মূর্তির নিবেদিত ভোগ থেকে ভোগ তুলে নিয়ে বলছেন: মাগো বেশ করে খা। আবার নিজেই মুখে দিয়ে বললেন, দেখবি তা হলে আমি খাব। বলতে বলতে নিজেই খেয়ে ফেলেন। আবার বলেন: এইতো আমি খেলাম, এবার তুই খা।

ভাগনে হৃদয় মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে দেখতেন এইভাবে। ভয়ে তিনি শিউরে উঠতেন। ভাবতেন একি পূজার নিয়ম? মামা কি উন্মাদ? যদি মথুরবাবু, রাণী মা খবর পান, তা হলে?

ভয়ে ভয়ে থাকতেন হৃদয়। কাউকে বলতেন না। এদিকে দেখতে পেলেন হৃদয়,—

একদিন একটা বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকতে দেখে তাকেই 'মা' 'মা' বলে ডাকলেন ঠাকুর।

ভোগের অন্ন মুখে তুলে দিলেন বিড়ালের মুখে—

আর কি দেখতেন হৃদয় ?

দেখলেন ঠাকুরকে, পূজার ধ্যানে তন্ময়। দেখতে পেতেন সকালে ফুল তুলতে তুলতে আপন মনে কথা বলছেন। দেখলেন রাত্রিবেলায় নিদ্রাহীন অবস্থায় সারা ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী, কখনো গান করেন, ভাবের ঘোরে একাই পঞ্চবটিতে শুয়ে রয়েছেন।

হৃদয় চুপ। কিন্তু ঠাকুরের এই ভাবগতিক যখন অন্যের চোখে নজর এলো ভাবলো সবাই, ঠাকুর পাগল হয়ে গেছে।

খবরটা গেল মথুরবাবুর কাছে।

মথুরবাবু এলেন।

নিজের চোখে দেখলেন।

কি দেখলেন তিনি ?

দেখলেন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে, জগতের এক দুর্লভ তিনি, যাঁর কাছে মন্ত্র নেই, জপ নেই, মায়ের ডাকে যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেইতো সাধক ? তাঁর দর্শন পবিত্র ও পুণ্য। ঠাকুরের অপূর্ব অকপট বিশ্বাস আর সরলতায় মথুরবাবু শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেলেন। মথুরবাবু দিব্যদৃষ্টি নিয়ে দেখলেন মায়ের ভুবন ভোলানো রূপের সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ ভাবময় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে—।

যেমন এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই চলে গেলেন মথুরবাবু। যাবার সময় বলে গেলেন, ঠাকুর যেমনভাবে পূজো করবেন তাতে যেন কেউ বাধা না দেয়।

ভক্তিমতী রাণী রাসমণি এসেছেন ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের ভাবগতিক টের পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। মথুরের কাছ থেকে সব শুনেছেন রাণী রাসমণি। ঠাকুরের কণ্ঠে মধুর সংগীত। মন্দির মুখরিত, আরতির ঘণ্টায় বন্দিত।

কিন্তু রাণী রাসমণির মন আরেক জগতে—তিনি ভাবছেন একটি মামলার পরিণতির কথা।

গোপনে ঠাকুর সবই জানলেন। গান থেমে গেল ঠাকুরের। রাগ করে বললেন ঠাকুর : এখানেও ঐ চিন্তা।

চমকে উঠলেন রাণী। লজ্জিতা হয়ে উঠলেন। ভাবমধুর সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় রাণী ঠাকুরের এই ভর্ৎসনাকে পরম পুরস্কার বলে মেনে নিলেন।

কেননা ঠাকুর যা করছেন, সবই তাঁর কৃপায়, ঠাকুর মা কালীর ইচ্ছায় এই কাজ করেছেন। শ্রীজগদম্বার সাধিকা রাণী রাসমণির ঠাকুরের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল তা এই ঘটনার দ্বারাই বুঝতে পারি--।

যতই দিন যায় ঠাকুর যেন আরেক জগতে চলে যান। মথুরবাবুকে একদিন বললেন ঠাকুর, আজ থেকে আমার ছুটি, এবার থেকে হৃদয় পুজো করবে, মা, বলেছেন হৃদয়ের পুজো ঠিকই আমার মত গ্রহণ করবেন।

ভাবাবেশে ঠাকুরের কথায় মথুরবাবু রাজী হলেন।

প্রথম থেকেই মথুরবাবু ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গভীর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে অন্তরে আলো জালিয়েছেন। তাই ঠাকুরের অনুরোধ মথুরবাবু রাখলেন।

ঠাকুরের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার দিকে দৃষ্টি দিলেন মথুরবাবু।

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন রামতারক চট্টোপাধ্যায়।

ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই, ঠাকুর বলতেন হলধারী বলে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামতারক। সুপণ্ডিত।

নিজ হাতেই রান্না করতেন। এতদিন হৃদয় পুজার কাজ করছিলেন। এবার ভার এলো রামতারকের উপর।

কথা প্রসঙ্গে বললেন মথুরবাবু, 'তোমার ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ আর ভাগনে হৃদয় তো ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ পাচ্ছে।'

বিচক্ষণ হলধারী। বললেন, আমার ভায়ের অত্যাধিক উচ্চাবস্থা, তার সবই মানায়। আমার এখনও সময় হয় নি, কাজেই নিষ্ঠা ভঙ্গ করলে আমি নিজেকে অপরাধী করব।

মথুরবাবু হলধারীর উত্তর শুনে খুশী হলেন। হলধারী নিজেই পঞ্চবটীতে গিয়ে রান্না করে খেতেন।

সাধনায় নিজেকে বিস্তার করলেন ঠাকুর। অগ্রসর হলেন নিত্য নব দর্শনে। মাকে পাবার আকুলতায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন সাধনায়। আর আশ্চর্য শক্তির প্রকাশে তিনি বিকশিত হলেন।

মাকে অন্তরে পেতে হলে তার আগে চাই আকুলতা। মায়ের মন্ত্রই যপ, তপ, ধ্যান, জ্ঞান।

ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শন সত্যে পরিণত হল। যোগ, সিদ্ধি ও ঈশ্বর লাভের পর আবার সাধন, এই সাধন মন্ত্রই জীবনের শ্রেষ্ঠমন্ত্র। তাই ঠাকুর বলতেন: "ঈশ্বরকে পেতে হলে মন মুখ এক করা চাই-ই।"

সাধনায় কিনা হয়! তারই আলোকে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। নিজের তৃপ্তির জন্য নয়, এ শুধু নিজেকে পাওয়া নয়, অন্যকে পাওয়া। ব্যাকুলতা দিয়ে মাকে ডাক, মায়ের ডাকেই ছুটে এসো তোমরা।

আমি দীন, আমি শরণাগত।

এমনি করে ঠাকুর নিজেকে চিনলেন।

আর তার প্রথম মনোযোগ এল দাস্য ভাবের। হনুমানের মতো তাঁর একাগ্রতা, ধ্যানের প্রবাহও তেমনি।

কুলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অন্তরে ডাক দিলো। অভিনব চিন্তায় আর নতুন দর্শন তাঁর।

একা বসে পঞ্চবটীতে। কোন চিন্তা নেই।

শুধু মুদ্রিত আঁখি কম্পিত সজাগদৃষ্টি।

সহসা ঠাকুরের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হলেন জ্যোতির্ময়ী নারী। কোন দেবী মূর্তি নয়, যেন অভাগিনী মানবী। ত্রিনয়নী মূর্তি নয়, সজীব। জ্যোতির্ময় মানবীর চোখে মুখে করুণার ধারা। কোথা থেকে ছুটে এলো এক হনুমান। নিমেষে মানবীর পাদপদ্মে অবলুণ্ঠিত। ঠাকুরের চিনতে দেরী হল না, জনম দুঃখিনী সীতাকে। 'মা' বলে ঠাকুর চীৎকার করে উঠলেন, পাদপ্রান্তে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন ঠাকুর। কিন্তু তার আগেই ঠাকুরের দেহে মূর্তি মিলিয়ে গেলেন। আনন্দে, বিস্ময়ে, অভিভূত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ঠাকুর।

ঠাকুর এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন: "ধ্যানে চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখ ভোগ করিতেছি।"

নির্জনতায় নিষ্ঠা আসে।

ধ্যানে তন্ময় হতে হবে।

তারই সন্ধানে ঠাকুর পঞ্চবটী স্থাপন করলেন।

পাঁচটি বৃক্ষ। (অশ্বত্থ, বেল, বট, অশোক, আমলকি)

ঠাকুর নিজের হাতে রোপন করলেন অশ্বত্থ বৃক্ষ। বাকীগুলো সব সংগ্রহ

করলেন ভাগ্নে হৃদয়। ঠাকুরের কাছে আসতে লাগলেন নানা ধরণের সাধু।

পঞ্চবটীতে ঠাকুর ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। ঠাকুর কোন এক সাধুর কাছ থেকে হঠযোগের কথা শুনে অভ্যাস করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের বলতেন: হঠযোগ একালের নয়। একে আয়ত্ত আনা দুঃসাধ্য। এর জন্য চাই কঠিন সাধনা।

হলধারী দক্ষিনেশ্বরে আছেন। তাঁর ওপর ভার দেওয়া হয়েছে কালী মন্দিরের পূজার। গোপনে গোপনে হলধারী প্রেমসাধকরূপে মগ্ন ছিলেন। লোকশ্রুতি হলধারী বাক্‌সিদ্ধ। অর্থাৎ যা বলবেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

লোকের মুখে মুখে এই কথা।

ঠাকুর শুনলেন।

একদিন ঠাকুর হলধারীকে বললেন: তোমার সাধন নিয়ে লোকের মুখে নিন্দা রটেছে, ও পথ ছেড়ে দিয়ে সহজ পথে এসো।

কথা শুনে হলধারী রেগে গেলেন।

ঠাকুরের চেয়ে বড় ছিলেন হলধারী।

ভাবলেন ছোট হয়ে এত বড় কথা। এত বড় অবজ্ঞা।

হলধারী রেগে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন ঠাকুরকে। বললেন: ছোট হয়ে বড় ভাইকে অপমান। তোর মুখ দিয়ে রক্ত বের হবে।

ঠাকুর হাসলেন।

সত্যি সত্যি কোন এক রাতে এ অভিশাপ সত্যে পরিণত হলো। ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হলো। কিছুতেই থামে না—। খবর পেয়ে ছুটে এলো সবাই।

হলধারী তখন মন্দিরে। এসে দেখলেন ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ঠাকুর বললেন: দাদা তোমার অভিশাপ মিলে গেছে।

হলধর কাঁদতে লাগলেন ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে।

গোলমাল শুনে ছুটে এলেন এক প্রাচীন সাধু, বললেন: ভয় নেই রক্ত বের হয়েছে, ভালই হয়েছে তুমি যোগ সাধনা করতে—তারই পরিণতি। মা তোমাকে তাঁর প্রয়োজনে তোমাকে রক্ষা করেছেন। শাপে তোমার বর হয়েছে।

হলধারী লজ্জিত।

ঠাকুর ভাবে মোহিত হলেন।

ঠাকুরকে সন্দেহ করতেন হলধারী। সংশয় ঘেরা মন নিয়ে বিচার করতেন। আবার কখনো ভাবতেন ঠাকুর পাগল, কখনো ভাবতেন স্বয়ং ভগবান।

মধুর রহস্যে ঘেরা ছিলেন পরস্পর।

ঠাকুরের পূজা দেখে হলধারী মুগ্ধ হয়ে বললেন: রামকৃষ্ণ এবার আমি তোকে চিনেছি।

তার উত্তর শুনে ঠাকুর সহাস্যে বললেন: দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়।

ঈশ্বর ভর করেছেন। এবার চিনেছি।

ঠাকুর বললেন: আচ্ছা দেখা যাবে।

সন্দেহের দোলায় দুলছেন হলধারী।

আরেকদিন ঠাকুর বললেন: তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়েছ, সে সবই বুঝতে পারি।

হলধারী শুনেই বললেন। তুই মুর্খ, তুই কি করে বুঝবি শাস্ত্রের কথা।

ঠাকুর বললেন নিজের দেহকে দেখিয়ে, সত্যি, এর ভিতরে যিনি আছেন তিনিই বুঝিয়ে দেন।—

রেগে আগুন হলধারী, বললেন: তুই একেবারে মুর্খ, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন শাস্ত্রে আছে। তুই পাগল। তাই ভাবিস এই সব কথা।

মধুর হাসিতে বলতেন ঠাকুর: এই যে বলছিলে আর গোল হবে না—

কিন্তু সে কথা আর শোনে না হলধারী। এমনি করে মধুর রহস্য দিয়ে হলধারীর সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সন্দেহ ছিল হলধারীর ঠাকুর সত্যিই পাগল।

সমস্ত বস্ত্র পরিহার করে ঠাকুর বসে আছেন ভাবাবেশে গাছের উপর। শিশুর মত হয়ে গেছেন ঠাকুর।

হলধারীর শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর কালীকে বলতেন তামসী বা তমোগুণময়ী।

কথা প্রসঙ্গে বললেন হলধারী, তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারেনা, তবে কেন তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর?

হলধারীর কথা শুনে ঠাকুরের অন্তরে ব্যথা এলো। কিছু না বলে ব্যথিত চিত্তে চলে গেলেন। এলেন কালীমন্দিরে।

সজল নয়নে মায়ের কাছে নিবেদন করলেন ঠাকুর : মা এতদিন যা দেখালি, সবই কি মিথ্যা, সব কি অলীক ? বল মা ? দু চোখে অশ্রু ঠাকুরের।

সহসা মায়ের দর্শন, সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত ঠাকুর। আনন্দে পুলকিত। রোমাঞ্চিত। তার পর ছুটে এলেন হলধারীর কাছে, হলধারীর কাঁধে চেপে উত্তেজিত কণ্ঠে বার বার বললেন ঠাকুর : তুই মাকে তামসী বলিস ? মা কি তামসী ? মা যে সব। ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধ-সত্ত্বগুণময়ী—।

ঠাকুরের স্পর্শে হলধারীর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো। অন্তর আলোকিত হল পূজার আসনে বসে হলধারী স্বীকার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য ধারণাকে। শুধু তাই নয় ঠাকুরের ভিতর স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব ঘটেছে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিগলিত হলধারী। ঠাকুরের পাদপদ্মে দিলেন অঞ্জলি। হৃদয়ও ছিলেন এই সময়। বিস্মিত সে।

হলধারী বললেন : কি জানি হৃদু—কালীঘর থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণ আমাকে কি যে করলে তা আমি বুঝতে পারলাম না—আমি সব ভুলে গিয়ে রামকৃষ্ণের ভিতর স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখতে পাই—ওর কাছে যখন যাই এমনিই হয়।

কালীবাড়ীতে এসেছে কাঙ্গালীর দল। নারায়ণের সেবায় মগ্ন রামকৃষ্ণ। একাসনে বসে আহার করছেন পরমানন্দে।

দেখলেন হলধারী, বিরক্ত হয়ে বললেন : একি করছিস তুই, তোর ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয় কি করে দেখব ?

উত্তেজিত রামকৃষ্ণ। বললেন : রেগে রেগে তবে রে শালা—শাস্ত্র বলাব সময় তুই না বলিস জগৎ মিথ্যা সর্বভূতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করতে হয় ? আমি বুঝি তোর মত জগৎ মিথ্যা বললো—ঠিক তোর শাস্ত্র বলে—।

হলধারী সাত বছর ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

যতই দিন চলে, কাল এগিয়ে আসে। মহাকালের ভৈরব তালে শ্রীবামকৃষ্ণেব সাধনাব পথ এগিয়ে আসে। আসন্ন এক শুভ লগ্ন এসে বুঝি দেখা দেয় নতুন, সূর্যোদয়। তাই নানা রূপে দেখা গেল এই সাধনায়। কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। দ্বৈতমনের এই আশ্চর্য ভাব সমাধি তীরে দাঁড়িয়ে যুগশ্রেষ্ঠ দেখালেন সাধনায় কি না হয় ? তপস্যার হোমানলে তিনি নিজেকে শুদ্ধ করেছেন যার জন্য দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি অর্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থেকে নিজেকে কঠোর তপস্যায় ব্রতী করে জগতের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। সমস্ত কামনা বাসনাকে ত্যাগ করে তিলে তিলে এগিয়ে এসেছেন সাধক জীবনের স্বর্ণদ্বারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মুক্তপুরুষ।

কামিনী কাঞ্চনকে ত্যাগ করলেন এক মুহূর্তেই, মনের বাসনাকে পরিত্যাগ করে এক হাতে টাকা আরেক হাতে মাটি নিয়ে পরীক্ষা করলেন। করতে করতে অনুভব করজেন টাকার ভিতর অসারত্ব ছাড়া কিছুই নাই, অনুভূতিতে প্রকাশ পেল মাটির মূল্যের উপরে আলাদা কোন মোহ টাকার নেই। সমস্তই তাই খুশীতে বুদ্ধিতে, প্রবল হয়ে গঙ্গার বুকে নিক্ষেপ করলেন টাকা।

অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে বার বার।

একই আয়নায় ছায়া মেলেছেন। দেখছেন নিজেকে নিজের মধ্যে দিয়ে। পরম পুরুষ অনুভব করলেন; তাঁর শরীর থেকে ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী বের হল। সন্ন্যাসী বললেন, সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ইষ্টই চিন্তা কর, আর যদি না করিস এই ত্রিশূল তোর বক্ষে বসিয়ে দেব—। আবার দেখলেন আরেক রূপে, এক তরুণ যুবক কামনায় শিখা নিয়ে শরীর থেকে নির্গত হল। পাপ আর কামনা, লোভ আর মোহ দিয়ে যুবকটি বিদ্ধ। আর সেই সঙ্গে সন্ন্যাসী মূর্তির আবির্ভাব—যুবককে নির্গত করে সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

চকিতে এমনি কত দিব্য দর্শন—।

ঠাকুরকে ঘিরে কলগুঞ্জন: উন্মাদ। পাগল হয়ে গেছেন।

শুধু কি তাই, আবার তিনি দেখলেন একই চেনামুখ। সেই এক, আরেক রূপে। যেন সেই জ্যোর্তিময় পুরুষ তাঁকে দিব্য দর্শন দিতেন।—সাধনার চার বৎসর পরে কামারপুকুরে এসেছেন। যাচ্ছেন হৃদয়ের বাড়ীতে। পাল্কীতে করে। দেখলেন ঠাকুর চিরশ্যামল প্রকৃতিকে, সোনার ধানক্ষেত, নীলাকাশ, বিরাট প্রান্তরে ছায়া ফেলেছে, নানা ফুলে শোভিত, অপরূপ মুগ্ধ ঠাকুর। হঠাৎ দু'জন কিশোর ঠাকুরের দেহ থেকে আবির্ভূত হল। শ্যামল কিশোর-দ্বয়, হাস্য সুধায় রঞ্জিত ঠাকুরের সঙ্গী হয়ে খেলছে, হাসছে, ফুল তুলছে। নীলাকাশের নীচে প্রান্তর মধ্য দিয়ে খেলা করছে কিশোরদ্বয়—তারপর আবার দেহমধ্য প্রবিষ্ট হল।

এ সাধনার দেড় বছর বাদে দক্ষিণেশ্বরের ভৈরবী বললেন ঠাকুরকে: "বাবা তুমি ঠিকই দেখেছ—এবার নিত্যানন্দের খোলে, চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে এসেছেন, তোমার ভিতরেই ওঁরা রয়েছেন।"

তাই ঠাকুর এ দর্শনের পর নিজেকে চিনলেন। যিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ আর এখন শ্রীরামকৃষ্ণ তারই প্রকাশ।

হলধারী, শ্রীরামকৃষ্ণের নানা রকমের দিব্য দর্শনকে অনাস্থা করতেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ঠাকুরকে বলতেন : ঈশ্বর যখন বাক্য মনের অতীত বলে শাস্ত্রে লেখা আছে, তখব তিনি কি ভাবে দেখা দেন ? শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহলে সমস্ত দর্শন মিথ্যা—।

ঠাকুর শুনে সমস্যায় পড়লেন।

ঠাকুর পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে বলেছেন প্রেমানন্দ স্বামীর কাছে "ভাবলাম তবে তো ভাবাবেশে যতকিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, কিংবা আদেশ পেয়েছি, সে সমস্তই ভুল। মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়েছে। মন বড়ই ব্যাকুল হল এবং অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলতে লাগলাম 'মা নিরক্ষর মুখখু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়।"

ঠাকুরের কান্না আর থামে না—

কুঠিঘরে বসে কাঁদছিলেন ঠাকুর। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর দেখলেন, সহসা মেঝে হতে কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠে পূর্ণ হয়ে গেল সে জায়গাটা, তারপর দেখলেন এক গৌরবর্ণ জীবন্ত মুখ। তার ভিতরে বুক পর্যন্ত দাড়িতে ঢাকা। সেই মূর্তি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন ওরে তুই ভাবমুখে থাক।

চমকে উঠলেন ঠাকুর। একবার নয়, বার বার তিনবার। শান্ত হলেন ঠাকুর। ধীরে ধীরে মূর্তিটি মিলিয়ে গেল।

মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি শেষ পর্যন্ত ভাবলেন ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—। ঠাকুরকে এই ব্রহ্মচর্য থেকে বিরত করবেন, উপায় খুঁজে বার করলেন মথুরবাবু। ঠাকুরকে প্রলোভিত করবার জন্য সুন্দরী বারনারীদের পাঠালেন।

ঠাকুর তাদের দেখলেন, আর দেখা মাত্রই তাদের মধ্যে খুঁজে পেলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে। 'মা-মা' বলতে বলতে জ্ঞান হারালেন ঠাকুর।

পাপবিদ্ধা নারীরা সজল নেত্রে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তের মধ্যে তারা ভুলে গেল তারা বারনারী, বাৎসল্যে মধুর হয়ে উঠল তারা। তারা বুঝলে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গে প্রলোভিত করতে গিয়ে তারা অপরাধিনী। সজল নেত্রে তারা ক্ষমা চাইলে ঠাকুরের কাছে। তারপর তারা অন্তরের প্রণাম জানিয়ে ঠাকুরের দর্শন লাভে ধন্য হয়ে চলে গেল নীরবে।

কামারপুকুরে খবর আসে মা চন্দ্রাদেবীর কাছে নয়নের নিধি গদাধর হয়েছে পাগল। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মা।

তাঁর মনে পড়ে, এই তো সেদিন তার নয়নের শ্যাম গদাধরকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে, আর সেই নয়নের নিধি গদাধর সে হয়েছে পাগল। জননী চন্দ্রার কান্নার শেষ নেই।

স্মরণতীর্থে জেগে ওঠে, কামারপুকুরের সেই পরিচিত পথ ধরে গদাধর চলেছেন, লাস্যে, হাস্যে, আনন্দময় করে তুলেছিলেন কামারপুকুরকে, গদাধরের লীলা নিকেতন আজ তাঁরই বিরহে কাঁদছে—।

পাগল হয়েছে গদাধর।

জননী চন্দ্রা কাঁদছেন—সাথীরা কাঁদছেন—পথ চেয়ে আছে সারা গ্রামের লোকেরা—কখন আসবে ফিরে গদাধর ?

মায়ের কান্না শুনে ছুটে আসেন মধ্যম পুত্র রামেশ্বর।

রামেশ্বর বলেন : মা তুমি কেঁদোনা—আমি চললাম তাকে ফিরিয়ে আনতে।

কামারপুকুরে ফিরে এলেন ঠাকুর। আবার খুশীর বান ডেকে ওঠে। যে দেখে সেই বলে কে বলেছে পাগল গদাধর ? চির আনন্দময় শ্যাম গদাধর।

মনে আসে, প্রেমের বৃন্দাবনে ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছেন ঠাকুর—আবার সেই ভাবাবেগ ধ্যান তন্ময়তায়, আবার ডুবে গেলেন নির্জনতায়। উদাসীন হলেন ঠাকুর সংসারের প্রতি। ঘুরে বেড়ান শ্মশানে। দেখতেন মাকে। মায়ের ডাকে, মায়ের মন্ত্রে আকুল হতেন ঠাকুর।

কেউ বললেন, পাগল নয় অপদেবতা ভর করেছে। ডাকা হল রোজাকে। ব্যর্থ হলেন তারা।

কেউ বললেন, না পাগল নয়, ছেলের বিয়ে দাও তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

জননী চন্দ্রা ভাবলেন ঠিকই তো। কিন্তু কে বলবে ঠাকুরকে এই কথা ?

ঠাকুর এখানে এসে কয়েক মাস পর আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন—

চন্দ্রা দেবীর মনের আশা, আমার গদাধরের জন্য চাই সোনার প্রতিমা—

রামেশ্বর বললেন : ঠিকই, আমি খোঁজ করি গিয়ে কিশোর গদাধরের জন্য সোনার প্রতিমা।

কিন্তু সব ঠিক হলেও কে বলবে ঠাকুরকে এই কথা। বলবে তাঁকে ভাব সাগরে ডুব দিয়ে কি লাভ বাপু, এস সংসারে মিশে যাও। জীবন তো দুদিনের। কিন্তু কেউ বলতে সাহস পায় না। ভয় করে, বলতে সাহস পায় না। ভয় করে

সবাই, যদি আবার পালিয়ে যায়—কিন্তু কে পালাবে? সবাইতো তাঁর জানা আছে। অজানা তো নয়।

শত চেষ্টা করেও যখন মনের মত পাত্রীর সন্ধান আনতে পারলেন না, রামেশ্বর, তখন আপন ভোলা পাগল ছেলে গদাধর রহস্য করে করে বলে দিলেন: জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটা খুঁটোয় বেঁধে রাখা হয়েছে দেখগে যা।

ভাব সাগরে ভাবনা মেলে দিলেন চির রহস্যময় ঠাকুর, গোপন ঠাকুর, সবই তাঁর মনে গোপনে ছিল সেই বলে দিলে কে তাঁর লীলা সঙ্গিনী।

জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো দুটি নাম। পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আর পরমাপ্রকৃতি শ্রীসারদামণি।

রামেশ্বর ছুটে যান, জয়রামবাটিতে—গিয়ে দেখেন সত্যি তো যেন সোনার প্রতিমা। ষষ্ঠ বর্ষীয়া কুমারী সারদাকে দেখে রামেশ্বর আবেদন জানালেন সারদা জনক শ্রীরামচন্দ্রের কাছে। শ্রীবামচন্দ্র সম্মতি জানালেন। রামেশ্বর চলে এলেন কামারপুকুরে।

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হল।

কামারপুকুরে এসেছেন সারদা।

জননী চন্দ্রার মনে কি আনন্দ—সংসাবী হয়েছে তাঁদের গদাধর।

দলে দলে ছুটে আসে কামারপুকুরের লোকেরা। প্রাণভরে দেখেন।

চন্দ্রাদেবী লাহাবাবুদের ধার করা গয়না পরিয়ে ঘরে বউ এনেছিলেন।

এবার ফেরত দিতে হবে। কিন্ত কেমন করে বালিকা সারদার গা থেকে খুলে নেবেন গয়না—।

মায়ের কান্না দেখে ঠাকুর বললেন: মা তুমি ভেবোনা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ঠাকুর ঘুমন্ত স্ত্রীর দেহ থেকে গয়না খুলে ফেললেন।

সকালে উঠে বললে বালিকা সারদা, আমার গয়না কই—

মায়ের চোখে জল, পুত্রবধূকে আদর করে বললেন, কেঁদোনা মা এর চেয়ে অনেক ভাল গয়না তোমার হবে।

বিবাহের কয়েক বছর পর বেজে ওঠে বিচ্ছেদের সুর—কামারপুকুরের সমস্ত আনন্দ গেল নিভে। ঠাকুর চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। আর সারদা তখন পিত্রালয়ে—

ভাগীরথীর কলধ্বনিতে জেগে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রহস্যঘন জগতকে উন্মোচিত করার সাধন ব্রত নিয়ে মেতে ওঠেন যুগের ঠাকুর। সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন ঠাকুর। ভুলে গেলেন কে তিনি ?

কে ছিল তাঁর ?

সাধনার উদ্দাম প্রবাহে চিরন্তনী হয়ে ধরা দিল এক অপরূপ সুধামণ্ডিত নতুন জগতে।

ভুলে গেলেন নব বিবাহিতা স্ত্রীকে। সাধনার স্রোতে বিলীন হয়ে গেলেন যুগ শ্রেষ্ঠ। তবুও সময় যায়—

পেছনকে ফেলে দিয়ে আরেক অধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরে এসে সেই আগের রূপে অপরূপ হয়ে উঠলেন ঠাকুর—।

শুধু প্রাণের আরতি 'দেখা-দে মা দেখা দে। আগের মত আবার গায়ের জ্বালা। ঘন ঘন নিত্য দেব দর্শন—

দিন আর রাত শুধু 'মা' 'মা' বলে ডাকা। আহার—নিদ্রা—সমস্ত কিছু ত্যাগ। চোখে ঘুম নেই।

ভাগনে হৃদয় ভীত। মথুরবাবুকে ডাকলেন : কবিরাজ দেখলেন, বললেন : এ দেহের রোগ নয় যোগের ফল। ঔষধে সারবে না।

চিন্তিত সবাই। ঠাকুরের কোন খেয়াল নেই। মহাকাল এগিয়ে চলেছে—

যুগদেবতার সাধন লীলায় নিত্য নবঘন শ্যামল ঠাকুর মেতে উঠেছেন। দিনের পর দিন চলে যায় কালস্রোতে ভীম ভৈরবীর রুদ্রতালে বেজে ওঠে, লহরিত হয়ে ওঠে পরিবর্তনের নানা সংকেত—সত্যটুকু জাগাবার জন্য মহান ঠাকুর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন মহাকালের অনন্ত রহস্যে। নিজেই তিনি নিজেকে রহস্যময় করে তোলেন।

বিশ্ব পথের আলোর সন্ধানে ঠাকুর তখন ভাবে আবেগে বিভোর হয়ে গেছেন মহানামে—কখনো কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাগলিনী শ্রীরাধিকা যেন—

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে কামারপুকুরে।

চন্দ্রাদেবী শুনলেন আবার—পুত্রের মঙ্গল কামনায় বুড়ো শিবের দরজায় হত্যা দিলেন। চোখের জলে দেবতার নামে প্রার্থনা জানালেন। চলে এলেন মুকুন্দপুরের শিবের দরজায়। নির্দেশ দিলেন বুড়ো শিব—

স্বপ্ন দেখলেন চন্দ্রাদেবী, স্বয়ং মহাদেব তাঁকে বলছেন ভয় নেই, তোমার ছেলে পাগল নয়, ঈশ্বরাবেশে তাঁকে এমন করেছে। মায়ের মন শান্ত হয়।

সময়ের তালে তালে ধরণী থেকে বিদায় নিলেন রাণী রাসমণি। রেখে গেলেন বিরাট কর্মের সূচনা, আর তাঁর সেই কাজকে সফল করে তুলবার জন্য মথুরবাবু সচেষ্ট হলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি দেহত্যাগ করলেন।

মথুরবাবু ঠাকুরকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরকে সব সময়ই চোখে চোখে রাখতেন তিনি।

দিনের পর দিন চলে যায়, সকলের ধারণা ঠাকুর পাগল হয়েছেন আপন মনে থাকেন, পূজো করেন না। তবুও নিজের হাতে কালীবাড়ীর পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ফুলের বাগান থেকে ফুল তুলতেন। অন্তরের আপন আরতি দিয়ে মাকে সাজাতেন। সামনেই মেয়েদের জন্য বকুলতলার ঘাট।

নিত্যকালের আনাগোনায় কাল এগিয়ে আসে। আর তারই মধুর ছন্দে ধ্বনিত হয় জীবন বেদের মন্ত্র। পরমপুরুষ প্রেমের ঠাকুরের লীলা নিকেতন আসে কত পুণ্যতীর্থ লোভীরা, চারিদিকে সৌরভ সে স্থিতি।

স্মরণের দৃষ্টি নিয়ে তাকাই, প্রসন্নচিত্তে ঠাকুর ফুল তুলছেন। এমন সময় দেখলেন একটি নৌকা বকুলতলার ঘাটে ভিড়েছে। দেখলেন সেই নৌকা থেকে নেমে আসছেন এক ভৈরববেশধারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণী! গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা। অসামান্যা রূপ-লাবণ্যে ঘেরা। দীর্ঘ এলায়িত কেশগুচ্ছ ভৈরবীকে দেখে ঠাকুর বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হলো যেন কত কালের চেনা। ঠাকুর তাঁকে নিজের লোক বলে মনে করলেন। ভৈরবীর বয়স চল্লিশ হলেও দেহে তাঁর যৌবনের সৌন্দর্য-ভাসে মণ্ডিত। ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরের ঘাটের দিকে এগোলেন! আপন অন্তরের আকুলতায় ঠাকুর চলে এলেন। তারপর বললেন হৃদয়কে, ডেকে নিয়ে আয়।

ঠাকুরের কথা শুনে হৃদয় চমকে উঠলেন। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললে সে, অপরিচিতা রমণী তাকে ডাকলে আসবে কেন?

ঠাকুর বললেন আমার নাম কর তা হলেই আসবে। হৃদয় স্তম্ভিত, না করবার উপায় নেই। যেতেই হবে। হৃদয় এসে দেখলেন ভৈরবীকে। বললেন সব। ভৈরবী কোন প্রশ্ন না করেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হৃদয় আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

ঘরে এলেন ভৈরবী।

দেখলেন ঠাকুরকে। ভৈরবী আনন্দে, উল্লাসে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তারপর অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, বাবা তুমি এখানে রয়েছ? তুমি গঙ্গাতীরে আছো জেনে তোমার দেখা পেলাম।

কি করে আমার খবর পেলে মা? কে দিলে আমার সন্ধান? ভাবাবিষ্ট ঠাকুর বলে উঠলেন।

ভৈরবী সহাস্যে জবাব দিলেন : তোমাদের তিন জনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, মায়ের কৃপায় সবই জেনেছি বাবা। দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে পূর্ববঙ্গে, এবার তুমি। তা হলেই তিনজন।

পরম আনন্দে, হৃদয়ের অপার যন্ত্রণায় সরল বিশ্বাসে শিশুর মত হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের কাছে ছেলের যেমন কোন লজ্জা থাকে না, ঠিক তেমনি করেই ঠাকুর অগ্রসর হলেন, বললেন সব।

ঠাকুর বললের : হ্যাঁগা এসব কেন হয়? কি করে হয় আমি কি সত্যিই পাগল?

ভৈরবী বিস্মিত হলেন। ঠাকুরের সব কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, আনন্দে উথলে উঠলেন। বারবার করুণায় বিগলিত হয়ে বললেন : কে বলে তুমি পাগল? না বাবা এ তোমার পাগলামী নয়, এ যে তোমার মহাভাব। এ ভাব ত মানুষের চেনা অসাধ্য।

ঠাকুর শুনছেন অধীর আগ্রহে।

ভৈরবী বললেন আরও : তোমার যে মহাভাব, ঠিক এমনি একদিন হয়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। তাঁরাও একদিন এই ভাবে পাগল সেজেছিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে, সে সব শাস্ত্র তোমাকে দেখাব। আমি সঙ্গে এনেছি।'

নিশ্চিত আশ্রয়ের ডানা মেলে দক্ষিণেশ্বরে এলেন ভৈরবী। আর তারই ছায়া তলে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। ভৈরবীকে মায়ের আসনে বসালেন ঠাকুর। ভৈরবী ঠাকুরকে দেখলেন ছেলের মতনই।

পঞ্চবটীতে পরমানন্দে দিন কেটে চলে। শাস্ত্র আলোচনার জটিলতার সামনে এগিয়ে দেন ভৈরবী, সংশয় মুক্ত হয়ে ঠাকুরও এগিয়ে আসেন অন্তরের আকুতি দিয়ে। ধ্যান সাগরে, ভক্তির বন্যায় প্লাবন বয়ে যায় পঞ্চবটীতে। ভৈরবী আলো দিয়ে আরও এগিয়ে দেন ঠাকুরের মনকে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভৈরবী দেখতে পান যুগের নারায়ণ রূপে।

দিন এগিয়ে চলে। দিন সাতেক পর কালীবাড়ী ছেড়ে ভৈরবী চলে যান গ্রামে। যেখানে গেলেও তাঁর মন পড়ে থাকত সাধক ছেলের কাছে। রোজই আসতেন, সময় কাটিয়ে যেতেন ভৈরবী, বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যেতেন। ভাবতেন ভৈরবী, সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য নন, অসামান্য হয়ে একদিন জগতের

সামনে প্রকাশিত হবেন। শাস্ত্রসাগরে ডুবে যেতেন ভৈরবী, তার সুধা গ্রহণ করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পঞ্চবটীর ছায়াতলে বসে আছেন ভাবমগ্ন ঠাকুর। সামনে মথুরবাবু ও পাশে হৃদয়।

কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন নিজের সম্বন্ধে, ভৈরবীর কি বাসনা বললেন তাই সে যে বলে অবতারদের মধ্যে যে সকল লক্ষণ থাকে, তা এই শরীর মনে আছে। তার কাছে শাস্ত্রের কথা শুনেছি।

সহাস্যে বললেন মথুরবাবু, তিনিই যাই বলুন না, অবতার যে দশটি আছে। কি করে তার কথা সত্য বলে মেনে নেব?

হাসলেন ঠাকুর।

মথুরবাবু আরও বললেন, তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা একথা সত্য।

এমন সময় ব্রাহ্মণী ভৈরবী এলেন এখানে। মথুরবাবু বললেন, ইনিই কি সেই?

ঠাকুর স্বীকার করলেন।

ভৈরবীব হাতে ছিল একথালা মিষ্টান্ন। ঠাকুরের হাতে দিলেন ভৈরবী মিষ্টান্নের থালা। মথুরবাবুকে দেখিয়ে বললেন ঠাকুর, ওগো তুমি আমাকে যা বলেছ, তাই আজ আমি ওকে বলেছি। ইনি বলেছেন 'অবতার তো দশটি ছাড়া নেই।'

মথুরবাবু ব্রাহ্মণীকে জানালেন প্রণাম। তারপর বললেন তাঁর কথা!

ভৈরবী হাসলেন, আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন। 'কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের চব্বিশটি অবতারের কথা বললেন, তাছাড়া তাঁর অসংখ্যবারের কথাও বলেছেন। বৈষ্ণবদের শাস্ত্র গ্রন্থেও সেকথা লেখা আছে।

মথুরবাবু অধীর আগ্রহে শুনলেন।

ভৈরবী জানালে, ঠাকুরকে দেখিয়ে, শ্রীচৈতন্যের দেহের সঙ্গে এঁর শরীর মনের প্রকাশিত লক্ষণ সকলের বিশেষ মিল আছে। ভৈরবীর এই কথা শুনে মথুরবাবু চুপ করে রইলেন।

ভৈরবীর ঠাকুর সম্বন্ধে ধারণাটার খবরটা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। কালীবাড়ীতে, বাইরেও তার আলোড়ন দেখা গেল। কে জানে কোন রহস্য ছলে লীলা করতে এসেছিলেন ভৈরবী। যার ফলে দেখা গেল, সময় কালকে বহন করে এগিয়ে আসে একটা চরম পরীক্ষার দিন।

ঠাকুর বললেন বালকের মতোই মথুরকে, সভা ডাকো।

এলেন অনেকেই। পণ্ডিত ও সাধু-সুধীদের সামনে ভৈরবী বললেন তাঁর মহাভাব। সকলেই একমতে রায় দিলেন।

বললেন ঠাকুর সত্যই অবতার বিশেষ। কিন্তু ঠাকুর তখন ভাব জগতের বাইরে ছিলেন। কে কি বললে তাঁর খেয়াল নেই। তাঁর শুধু একই চিন্তা কেমন করে তিনি পাবেন সত্যের সন্ধান।

ঠাকুর ছিলেন শিশুর মতন সরল, তাঁর হৃদয় ছিল করুণার ধারায় প্লাবিত।

ভৈরবী তাঁর ধারণা নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করে দেবেন বলে। ভৈরবী তাঁর মায়া মমতা দিয়ে এগিয়ে এলেন ঠাকুরকে আরও জাগাবার জন্য।

ভৈরবী বললেন ঠাকুরকে : তন্ত্রোক্ত সাধন মার্গ অবলম্বন কর। যার দ্বারা তোমার শক্তি তুমি নিজেই জানতে পারবে।

ভৈরবী দেখলেন নিজের অজেয় শক্তি দ্বারা ঠাকুরকে দেখাবেন তাঁর যা আছে সাধক তন্ত্র।

ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ। ভাবলেন, সাধক জগতের যা জানবার সবই জেনে নিতে হবে ভৈরবীর কাছ থেকে—।

গুরু হলেন ভৈরবী, আর শিষ্য হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আপন সাধনায় ডুবে গেলেন ঠাকুর। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ভৈরবী তা দেখছেন। এমনি করে কাল কাটে···

তন্ত্র সাধনায় মগ্ন ঠাকুর। সামনে তাঁর গুরু ভৈরবী।

পঞ্চবটীতে দুটো আসন স্থাপন করা হয়েছে। বেদিকাতে নরকঙ্কাল।

সময়কাল দ্রুত এগিয়ে চলে।

এই তন্ত্র সাধন প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) গ্রন্থ থেকে কিছু উল্লেখ করছি।

ঠাকুর বলিতেন···বিষ্ণু ক্রান্তায় পালিত চৌষট্টি খানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়া ছিল। কঠিন কঠিন সাধন যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয় মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

"একদিন দেখি ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণ যৌবন সুন্দরী রমণীকে আনিয়াছেন, এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে

বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে বলিতেছে বাবা সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময় চিত্তে জপ কর। তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে বলিলাম, 'মা তোর শরণাগতকে একি আদেশ করিতেছিস্? দুর্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ কোথায়। ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্য বলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতা বিষ্টের ন্যায় কি করিতেছি সম্যক না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবা মাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। অনন্তর যখন জ্ঞান হইল ব্রাহ্মণী বলিল, "ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা, অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছু কাল জপমাত্র করিয়াই শান্ত হয়, তুমি এককালে শরীর বোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছো।"—শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

এই তন্ত্র সাধন কালের ঘটনা, একদিন ভৈরবী শবের উপরে মাংস রান্না করে শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করলেন, ও ঠাকুরকে তাই করতে বললেন। মনে মনে কোন ঘৃণাও এলো না ঠাকুরের, ভৈরবীর আদেশে তাই করে বসলেন।

ঘৃণা ত্যাগ করে নিজেকে মুক্ত কর এই সাধন নিয়ে ভৈরবী গলিত মহামাংস খণ্ড এনে দিলেন ঠাকুরের কাছে।

তা দেখে শিউরে উঠলেন সেই সঙ্গে ঘৃণাও এলো ঠাকুরের।

ঠাকুর বললেন: একি খাওয়া যায়?

ব্রাহ্মণী ভৈরবী বললেন, সে কি বাবা, এই দেখ আমি খাচ্ছি। ঘৃণা করতে নেই।

এই বলে ভৈরবী খেতে শুরু করলেন।

ঠাকুরকে ভৈরবী আবার বললেন 'ঘৃণা করতে নেই।' ঠাকুরের সামনে ভৈরবী যেন মায়ের মূর্তিরই ছায়া হয়ে ধরা দিলেন।

ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে জ্ঞান হারালেন।

ভৈরবী সেই অবস্থায় ঠাকুরের মুখে নরমাংস তুলে ধরলেন।

ক্রমশঃ তন্ত্র সাধনার শেষ ধাপে এলেন ঠাকুর।

ভৈরবী বললেন: বাবা তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়েছো।

তন্ত্র সাধন অন্তে শিশুর মতন সরল হয়ে যেতেন ঠাকুর। বসন ঠিক থাকত না তাঁর। তাঁর মন ও দেহ নিবেদিত ছিল মায়ের চরণে। তিনি ছিলেন শিশুর মতন সরল। মার কোলে তাঁর আশ্রয়, এই জেনেই অগ্রসর হলেন ঠাকুর।

সমস্ত নারীর মধ্যেই মাতৃভাব এ কথাই তাঁর মনে গাঁথা ছিল। বীর ভাবের সাধন সময়েই বয়সী সকলকে 'মা-মা' বলে ডেকে তৃপ্তি পেতেন। প্লাবিত হত তাঁর নয়নের ধারা। কারণের নামে জগৎ-উদ্দীপনায় ঠাকুর তন্ময় হয়ে যেতেন—আত্মহারা হয়ে যেতেন। যোনি শব্দ শুনেই জগদ্‌যোনির ধ্যানে ডুবে যেতেন।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন বেদের মন্ত্র ছিল অপূর্ব ও বিস্ময়কর—

ঠাকুর দেখলেন মোহিনী মায়ায় জগদ্‌মাতাকে একদিন। দেখলেন গঙ্গার জলের মধ্য থেকে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী নারী পঞ্চবটির দিকে আসছেন। দেখলেন পরমা সুন্দরী রমণী পূর্ণগর্ভা—। ঠাকুরের সামনেই একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, তারপর ঠাকুরের সামনের পরম স্নেহে স্তন দান করছেন শিশুকে—তারপরেই দেখতে পেলেন সেই পরমাসুন্দরী নারী কঠোর করালবদনা হয়ে শিশুকে গ্রাস করলে, তারপর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলেন।

এই ভাবে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব করতেন—ঠাকুর সহজেই পশু-পাখীর গান শুনে তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন।

তন্ত্র সাধন-কালে ঠাকুরেব অঙ্গ কান্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন সবাই। তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে সকলে মুগ্ধদৃষ্টি নিয়ে তাকাতেন।

ঠাকুর ভয় পেতেন তাঁর এই রূপলাবণ্যে। আকুল হয়ে বলতেন মাগো আমার বাইরের এ রূপ চাইনে মা, ফিরিয়ে নে আমার এই রূপ, আমি আলো চাই, অন্তরের আলো—আমায় শক্তি দে, আধ্যাত্মিক রূপ দে—।

ঠাকুর বলতেন : তুলসী ও সজনে গাছের পাতা সমানভাবে পবিত্র।

ভৈরবী এসেছিলেন ঠাকুরের জীবনে, তন্ত্র সাধন কালে তাঁর আন্তরিকতা ছিল আপন ব্যাকুলতায়। ভৈরবীর হৃদয়ে ঠাকুর জাগিয়েছিলেন অপার অনন্তকালের দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠার সূচনা—

ভৈরবীকে ঠাকুর বলতেন যোগমায়ার অংশ সম্ভূতা—ভৈরবীর নাম ছিল যোগেশ্বরী।

তন্ত্র সাধনা প্রভাবে ঠাকুরের অন্তরে আলোকের বন্যা বয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভতম তন্ত্র সাধন প্রতিষ্ঠায় বরেণ্য হলেন ঠাকুর।

মায়ের সেবক হয়ে, দীন হয়ে ঠাকুর অনুভব করলেন, উত্তরকালে তাঁর কাছে আসবে দলে দলে ধর্মপ্রাণা নরনারীর দল, অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করে ঠাকুর তাঁদের শোনাবেন মাতৃমন্ত্রের মধুর নাম।

হৃদয় আর মথুরবাবুকে ঠাকুর বললেন তাঁর এই উপলব্ধির কথা।

তা শুনে অনুগত মথুরবাবু বললেন : বেশ তো, সবাই মিলে তোমাকে ঘিরে আমরা আনন্দ করব।

পবিত্র তীর্থ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসতেন তীর্থকামীর দল। তাঁদের মনের জ্বালা মেটাতেন। বিশ্রাম করে আবার ফিরে যেতেন। দেখতেন ঠাকুরকে। এমনি করেই এই আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে এলেন ১২৭০ সালে এক জটাধারী নামক রামাইত সাধু।

এলেন শ্রীজটাধারী কালীবাড়ীতে। দেখা পেলেন ঠাকুরের।

তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন শ্রীজটাধারী, আর সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সাথী শ্রীরামচন্দ্র--। শ্রীজটাধারী ছিলেন পরম জ্ঞানী ও ধার্মিক। শ্রীরামচন্দ্রের করুণায় ধন্য--জটাধারী।

ঠাকুর দেখলেন, একই আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জটাধারীকে। অপূর্ব আনন্দময় জটাধারী সঙ্গে এনেছেন ধাতু নির্মিত শ্রীরামচন্দ্রের শৈশব মূর্তি। সব সময়েই নিজের কাছে কাছে রাখেন জটাধারী।

ঠাকুর দেখলেন, দেখলেন প্রকৃত রূপদক্ষের মতন। চিহ্নিত করে নিলেন জটাধারীকে বিরাট প্রেমিক সাধকরূপে। তাঁর নিবিড় দর্শনে বাধা ছিল চির প্রেমের শাশ্বত রূপ অপরূপ সে ধ্যানে পূজার আবর্তিতে ধ্যান মগ্ন শ্রীজটাধারী। প্রাণের ঠাকুর তাঁকে নিত্য সংগ দিয়েছেন। জটাধারীর অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে। শ্রীরামচন্দ্রের শৈশব মূর্তির মাধ্যমেই নিজেকে খোঁজেন পরিপূর্ণভাবে।

সময়ের দ্রুত গতিতে প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ল দুটি হৃদয়। ঠাকুর আর জটাধারী দু'জনেই এগিয়ে গেলেন একই পথের দিকে।

ঠাকুর দেখলেন বিচিত্র ভঙ্গীমার জটাধারীকে। প্রথম দর্শনেই টল্‌মল্‌ হয়ে উঠলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মতনই অপরূপ ভক্তির উৎস ছিলেন জটাধারী যা ঠাকুর দেখে তৃপ্তি পেতেন। বিস্ময়ে, চকিতে ঠাকুর ভাবে বিভোরে জটাধারীর মতন পাগল হয়ে উঠলেন এই সময় ঠাকুর নিজেকে রমণীর মতন ভেবে শ্রীজগদম্বার সেবা করেছেন। কখনো রমণী বেশে থেকেছেন। পুষ্প সংগ্রহ করেছেন, মালা গেঁথে সখী ভাবের সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

জটাধারীকে পেয়ে ধন্য হলেন ঠাকুর।

তাঁর আকর্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের শিশুমূর্তি ঠাকুরকে হৃদয়ের আসনে সিংহাসন পেতে দিলেন। মায়ের মতন যত্নশীল ঠাকুর। তাঁর দর্শনে পাগল হয়ে যেতেন ঠাকুর। বিস্ময়ে অভিভূত জটাধারী। মন্ত্র শেষে বিকশিত হলেন ঠাকুর।

দিব্যদর্শনে মধুর হয়ে উঠলেন ঠাকুর। শ্রীরঘুপতি-রামের মন্ত্রকে উজ্জীবিত করে জটাধারী। ক্রমশ 'রামলালকে' আপন করে নিলেন ঠাকুর।

জটাধারী বুঝলেন এবার বিদায় নেবার পালা।

তাই সজলদৃষ্টি নিয়ে বললেন জটাধারী, 'রামলালা' তাঁর পরম স্নেহ করুণায় আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। যেমনভাবে আমি তাঁকে দেখতে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর দেখা পেয়েছি।

আনন্দ-অশ্রু চোখে জটাধারী আরও বললেন ঠাকুরকে, তাঁরই কৃপায় জেনেছি, তুমিই তাঁর নিত্য সঙ্গী, তোমাকে ছেড়ে দিতে চায় না তাঁর মন। তাই তোমার কাছে রেখে গেলাম রামলালাকে।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে রাসলীলা বিগ্রহটি দান করে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন জটাধারী···আর রেখে গেলেন ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী রামলালাকে। সে বিগ্রহ শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে রক্ষিত আছে।

আজ জগতে সমস্ত মানবই ঠাকুরকে 'রামকৃষ্ণ' বলে জানে, রামকৃষ্ণ নাম জপ করে, রামকৃষ্ণ মূর্তি ধ্যান করে অমৃত জীবনের সন্ধান পেয়ে থাকে।

ঠাকুর বলতেন ভক্তদের সংশয় দূর করে দেবার জন্য 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে এবার ছদ্মবেশ।'

এই পরম জীবনের সত্যটুকুই সম্বল করে বিশ্বজননীর বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আর সে দিন থেকেই জগন্মাতার নির্দেশ পেলেন ঠাকুর, তাঁকে বল্লেন: 'এ নামের সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিল রেখে চলতে হবে। পূর্ণাঙ্গরূপে হতে হবে রাম, হতে হবে কৃষ্ণ—লোক কল্যাণে রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থ থেকে রাম ও কৃষ্ণের জীবন সত্য, জীবন মাধুর্য, জীবনাদর্শকে গৃহে রূপায়িত করাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য! (রামকৃষ্ণায়ন)

আমাদের প্রাচীন কাব্য গাঁথা থেকে সুরু করে রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ ভাগবতকে ভুলে গিয়ে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ধারাকে ভুলে পাশ্চাত্য দেশের প্রতি মোহ জন্মাল—সেই সংকটময় দিনে একদিন মহাপুরুষ ঋষিতুল্য ক্ষুদিরামের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন গদাধর, সেদিন থেকে তাঁর জীবন দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এ ধরণীর বুকে তিনি এলেন পথভ্রান্ত জাতিকে আশার আলো জাগাতে। তিনি দেখেছিলেন তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? দেখিয়েছেন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। সেই জীবনকে মহীয়ান করে তোলার জন্যে

ঠাকুর তাঁর বাণীতে আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অন্ধকারেও পথের আলো পাওয়া যায়।

ঠাকুর বলেছিলেন : দেখবি একদিন ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।

আজ তিনি ঘরের ঠাকুর, তাঁর নামে মধুর হয়ে ওঠে মন, স্মরণাতীতকাল থেকে চির বরেণ্য তিনি।

সাধকের মহান জীবনকে সাধারণ মানুষের বোঝা দুঃসাধ্য। তাই মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবনের বিচিত্র জীবন আমাদের কাছে চির রহস্যে ঘেরা। স্বার্থ সংঘাত, লোভে লালসার যে সংসারে মানুষের নিত্য আনাগোনা, যেখানে শুধু মানুষ চায় নিজেকে বড় করে তুলতে; সেই সব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে যে মানব ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করেন তিনিই সাধক।

ঠাকুর বলতেন : সংসারে আছিস বলে মায়ার দাস হবি কেন? সমস্ত মায়ের পাদপদ্মে উৎসর্গ করা, তিনিই তোকে রক্ষা করবেন।

আর এই সত্যটুকুকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্যেই তাঁর জীবনে মধুর ভাবের সাধনায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। আকুলতায়; ব্যাকুলতায়, বিশ্বাসে সবই পাওয়া যায়, তাই ঠাকুর বলতেন শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ দিয়ে : "তোর ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতির মনের টানটাই শুধু দেখ না, ধর না, ঈশ্বরে টান হলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি; গোপীরা স্বামীপুত্র, কুল-শীল, মান অপমান, লজ্জাঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয় সব ছেড়ে শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মনা হয়েছিল —ঐরূপ করতে পারলে তবে ভগবান লাভ হয়।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড)

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবে মধুর সাধনায় ব্যাকুল হয়েছেন যে কোন অবস্থায় ঈশ্বরকে পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হতেন। শাস্ত্রকে সত্য বলে তিনিই মেনে নিতেন, তাকে প্রমাণ করে দেবার জন্যই ঠাকুর মধুর ভাবের সাধনায় তন্ময় হয়ে যেতেন।

বীর সাধক স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার ইতিহাসে কতটুকু সত্য আছে সেই প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামীজী বলতেন : সমস্তই মানুষের কল্পনা। বলামাত্র ঠাকুর বলতেন : ধরে নিলাম শ্রীমতী রাধিকা নামে কেউ কোনদিন ছিল না, কোন প্রেমিক সাধকের কল্পনায় আঁকা হয়েছে। রাধার চরিত্র কল্পনা করতে গিয়ে প্রেমিক সাধককে শ্রীমতী রাধার ভাবে তন্ময় হয়ে যেতে হয়েছিল, এ কথা মানিস তো?—সাধকের মত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর, আর নিজেকে শ্রীমতী রাধা ভেবে প্রেম সমর্পন কর।

ঠাকুর তাই ব্যাকুল হতে পেরেছিলেন, তাঁর আকুলতায় ছিল অসীম তৃপ্তি। মধুর ভাবসাধনে নিজেকে নিবেদিত করলেন ঠাকুর; মধুরভাবে প্রবৃত্ত হয়ে স্ত্রীবেশে নিজেকে সাজালেন ঠাকুর। ভুলে গেলেন সব। নিজের আয়নায় আরেক ছায়া হয়ে ধরা দিতেন। মায়ের আগ্রহে তাও রূপ পেল অপরূপ। মধুরভাব সাধনকালে দীর্ঘ ছয়মাস নিজেকে রমণীবেশে সজ্জিত করেছিলেন ঠাকুর। রমণীর যা কিছু রূপ আর গুণ ঠাকুরের মধ্যে তাঁর প্রকাশ পেয়েছিল। মথুরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে নিজেকে স্ত্রীজ্ঞানে নিবদ্ধ রাখার জন্য কিছুকাল থাকলেন। অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঠাকুর। পুরুষ বলে কেউ মনে করত না। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য শ্রীরাধিকার বেশে রূপায়িত হলেন তিনি। বিরহ ব্যাকুলা শ্রীমতীর মতনই তাঁর দিন কেটে যায়।

শ্রীমতীর কৃপা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া দুঃসাধ্য। এ কথা জেনেই ঠাকুর শ্রীরাধার উপাসনায় রত হলেন। ভক্তি ও ভাবে মধুর হয়ে শ্রীমতীর ধ্যানে নিজেকে মগ্ন রাখলেন; আর তারই তপস্যায় জয়ী হলেন ঠাকুর। দর্শন লাভে ধন্য হলেন ঠাকুর। শ্রীরাধিকার দর্শনে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। সেই অপূর্ব মূর্তি ঠাকুরকে দেখা দিয়ে তার দেহে বিলীন হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলতেন; শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্বহারা সেই নির্মল চিব আনন্দময় মূর্তির মহিমা ও তার মধুরতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুঙ্গের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।

এই অভিনব দর্শনের পর থেকে ঠাকুর নিজেকে ভাবতেন শ্রীমতী রাধিকারূপে।

মধুর ভাবের সাধনার শেষে ভাব সাধনার শেষে এলেন ঠাকুর। উনিশ রকমের ভাবের যে মহাভাব সে প্রসঙ্গে ঠাকুর বলতেন নিজেকে দেখিয়ে, এই শরীরে সেই মহাভাবের পূর্ণ প্রকাশ। প্রেম, সখা, দাস্য, শান্ত, অনুরাগ প্রভৃতি মহাভাবের অংশ। তাই ঠাকুর তাঁর শরীরে মহাভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে বিরহ যন্ত্রণায় জ্বলে যেতেন, কেবলই তার কণ্ঠে ধ্বনি দেখা যেতো, কোথা কৃষ্ণ। এই আকুল ডাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনি দর্শন পেলেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি তার দেহে বিলীন হয়ে গেলো ধ্যানে, চিন্তায় প্রতি নিয়ত ঠাকুর ভাবতেন তিনিই কৃষ্ণ।

মধুর ভাব সাধনা কালের ঠাকুর তন্ময় হয়ে ভাগবত পাঠ শুনছেন চোখের জলে প্লাবিত প্রেমের ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপ ঠাকুর দেখলেন। পরে আরও দেখলেন ঐ মূর্তির পাদপদ্ম থেকে একটি জ্যোতির রেখা প্রথমে ভাগবৎ গ্রন্থকে ও পরে ঠাকুরকে স্পর্শ করে ক্ষণকাল আবদ্ধ রইল।

ঠাকুর বলতেন, এ দর্শনে তার মনে এই কথাই জেগেছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিন প্রকার ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও এক পদার্থ বা একই পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত।

এমন সময় কয়েকজন শিষ্যদের মনে প্রশ্ন জাগল, জগন্মাতার দর্শনের পরও কেন এই কষ্টার্জিত সাধনা? অন্তরের ঠাকুর জেগে উঠলেন, তাই ঠাকুর তার শিষ্যদের বললেন, সমুদ্রের তীরে যে মানুষ বাস করে, তার মনে যেমন কখন কখন বাসনা জন্মে, রত্নাকরের গর্ভে যত রকমের রত্ন আছে তাই দেখি, ঠিক তেমনি মার কাছে সব সময় থেকেও মনে হত অনন্তময়ীর বিভিন্ন প্রকাশ নানা ভাবে দেখব। তাই বিশেষ কোন ভাবে তাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা হলে তার জন্য মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতাম।

মধুর ভাবে সাধনা করে অদ্বৈতভাব সাধনার প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখা দিল ঠাকুরের, সেই সাধনায় মায়ের নির্দেশে সত্য আলোর শিখা নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর সেই সময়েই ১২৭১ সালে পরমহংস তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

তোতাপুরী ভারতের বহু পুণ্যভূমি দর্শন করেছিলেন।

পুণ্যতোয়া নর্মদার তীরে দীর্ঘকাল সাধনায় নিমগ্ন থেকে নির্বিকল্প সমাধির পথে ব্রহ্ম লাভ করেছিলেন।

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফিরবার সময় বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়ার সময় তোতাপুরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তিনদিনের বেশী এক জায়গায় থাকতেন না তোতাপুরী।

কালীবাড়ীতে তিনদিন থেকেই চলে যাবেন এই কথা মনে করেই এখানে এসেছিলেন।

তোতাপুরী যখন দক্ষিণেশ্বরে ঘাটের চাঁদনী থেকে মন্দির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন ঠাকুরকে। ঘাটের একপাশে ঠাকুর চুপ করে বসে আছেন। তোতাপুরী প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন ঠাকুরকে দেখে। ঠাকুরের তপোদীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানি দেখে তোতাপুরী অনুভব করলেন ঠাকুরকে। তার মনে হলো এই পুরুষ মহামানব, অসামান্য।

তোতাপুরী বিস্ময়ে অভিভূত। স্থির থাকতে পারলেন না, বললেন ঠাকুরকে, তুমি বেদান্ত সাধনা করবে?

ঠাকুর দেখলেন দীর্ঘ দেহ জটাধারী উলঙ্গ সাধুকে। তারপর তোতাপুরীকে বললেন, আমি কি করব না করব কিছুই জানিনে। মা আমাকে যেমনভাবে

চালান, আমি সেই ভাবে চলি। সব মা জানেন।

তোতাপুরী প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়ে বললেন, বেশ তুমি তোমার মার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। আমি এখানে বেশী দিন থাকব না।

ঠাকুর কোন কথার উত্তর না দিয়ে চলে এলেন। জগদম্বার মন্দিরে এলেন ভাবে আবেগ বিভোর। শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনতে পেলেন ঠাকুর, যাও তোমাকে শেখাবার জন্যই এখানে এসেছে সন্ন্যাসী।

তোতাপুরী ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী। শক্তি পূজায় ছিল না আস্থা, তোতাপুরী বললেন, শক্তি ত অলীক মায়া। ঠাকুরের ভাবমগ্নতা লক্ষ্য করে হাসলেন তোতাপুরী—।

বেদান্ত সাধনার পথে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। তোতাপুরী বললেন ঠাকুরকে, এবার তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে, তোমার সমস্ত নতুন হতে হবে।

ঠাকুরের তাঁর মায়ের কথা মনে হলো, মা যদি দেখতে পান ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তাহলে মায়ের দুঃখের শেষ থাকবে না। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাবতী এখানেই ছিলেন। যখন খবর পেলেন যে তাঁর ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছে, তখন ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। বাকী জীবন গঙ্গার তীরে কাটাবেন এই বাসনা।

ঠাকুর বললেন তোতাপুরীকে, গোপনে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারি, প্রকাশ্যে নয়, কেননা মায়ের মনে কষ্ট দিতে পারিনে আমি।

তোতাপুরী সহাস্যে বললেন, বেশ তাই হবে, তোমাকে গোপনেই দীক্ষা মন্ত্র দেব।

এবার শুরু হল নতুন অধ্যায়।

তোতাপুরী তাঁর আসন সাজালেন পঞ্চবটীতে। গুরু রূপে বরণ করে নিলেন ঠাকুর তাঁকে। তোতাপুরীর নির্দেশ মত ঠাকুর কাজ করে চলেছেন। বেদান্ত সাধনায় এগিয়ে এলেন ক্রমশঃ।

ধ্যানে মগ্ন ঠাকুর।

তোতাপুরী সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন। ঠাকুরকে বললেন তোতাপুরী, পরম ব্রহ্মে মন লীন কর।

ঠাকুর পারলেন না। চেষ্টা করলেন জগতের সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, হলেও বরাভয়করা জগন্মাতার মূর্তিকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলেন না। জগদম্বা সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছেন ঠাকুরকে।

ঠাকুর আকুল হয়ে বললেন : হলোনা, হলোনা, আমার দ্বারা হবে না।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তোতাপুরী, রেগে গিয়ে বললেন, কেন হবে না, কেন পারবে না তুমি ? তোমাকে করতেই হবে ?

বলতে বলতে এক টুকরো ভাঙা কাঁচ হাতের কাছে পেয়েই ঠাকুরের ভ্রূ মধ্যে সজোরে বিদ্ধ করে বললেন, "এই বিন্দুতে মনকে সংযত কর !

ঠাকুর তাই করলেন। কোন বিকল্প আর নেই ঠাকুরের। ভাব সমাধিতে ডুবে গেলেন।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত তোতাপুরী। একদিন নয় পর পর তিন দিন সমাধির মধ্যে ডুবে রইলেন ঠাকুর।

তোতাপুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, একি দেখলাম আমি। আমি চল্লিশ বছর ধরে দীর্ঘ কঠোর সাধনায় যা পেয়েছি, আর তিনদিনে এ তা আয়ত্ত করলে।

তবে কি দৈব মায়া ? স্থির থাকতে পারলেন না। সমাধি ভঙ্গের জন্য নানা রকমের যৌগিক প্রক্রিয়া স্বরু করলেন।

সমাধি থেকে জেগে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোতাপুরী দেখলেন পরম আনন্দে। গুরু শিষ্যের মিলন হল নতুন করে।

তোতাপুরী এসেছিলেন তিন দিনের জন্য। কিন্তু শিষ্যের অদ্ভূত আকর্ষনে দক্ষিণেশ্বরে এগার মাস ছিলেন।

বৈদিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী ঠাকুরের বেদান্ত সাধনের গুরু।

পঞ্চবটীর তলায় জ্বলছে ধুনি। পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ।

বৈদিক সন্ন্যাসীরা ধুনিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখলেন।

ধুনির আলোতে বসে তোতাপুরী বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির কথা।

এই সময় ঠাকুরবাড়ীর একটি মালী তামাক খাবার লোভে জ্বলন্ত ধুনি থেকে আগুন নিতে এলো।

দেখেই রেগে গেলেন তোতাপুরী। সামনের লোহার চিমটা তুলে ভয় দেখালেন মালীকে।

মালী ভয় পেয়ে চলে গেলো। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। আর বলছেন, দুর শালা, শালা। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন ঠাকুর। তোতাপুরী বললেন। দেখলে কী অন্যায়, ধুনির আগুন নিয়ে তামাক খেতে চায় ? তা তুমি হাসছো কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ভাবছি তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড় দেখে, এই বলছিলে

ব্রহ্মবই দ্বিতীয় সত্তা নেই। জগতে সব কিছু তারই প্রকাশ আর তা ভুলে গেলে তুমি, মারতে গেলে লোকটাকে··· ।

তোতাপুরী গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক বলছো তুমি, রাগ করা অন্যায়।

দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময়েই তোতাপুরীকে কঠিন আমাশয় রোগে ভুগতে হল। তোতাপুরীর দেহে এর আগে কোন রোগ যন্ত্রণা দেখা যায় নি কাতর হয়ে উঠলেন তোতাপুরী। মথুরবাবু চিকিৎসার সমস্ত কিছু আয়োজন করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে তোতাপুরী ভাবলেন এ দেহ যদি অনিষ্টের কারণ হয়, তা হলে কি দাম এ দেহের ?

গভীর নিশীথ রাত্রি। তোতাপুরী গঙ্গার জলে নামলেন। ভাগীরথীর গর্ভে নিজের জীবন দেবেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার প্রায় অপর তীরে গেলেন, কোথাও এক হাঁটুর বেশী জল পেলেন না। একি মায়া ? তোতাপুরী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তবে কি পরম ব্রহ্ম যেমন সত্য ও নিত্য মায়া রূপিণী ও জগন্মাতা তেমনি নিত্য রূপিণী, সর্বত্র তাঁর চলাচল। আনন্দময়ী মায়ের প্রভাবেই তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশ।

তোতাপুরী ফিরে এলেন।

তার পরের দিন সকালে এলেন ঠাকুর। পঞ্চবটীতে তোতাপুরী বসে আছেন।

ঠাকুর হাসলেন দেখলেন যেন এক নতুন মানুষ। তোতাপুরী বললেন সব। বললেন তাঁর গত রাত্রে অভিজ্ঞতার কথা। মাকে তিনি মা বলে স্বীকার করলেন।

সদাপ্রসন্নময় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তা হলে আমি ঠিক বলেছি। মা আমাকে অনেক আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন ব্রহ্ম শক্তি অভিন্ন যেমন অগ্নি তার দাহিকা শক্তি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলেন। চির আনন্দময় ঠাকুর তোতাপুরী চলে যাবার পর থেকেই অদ্বৈতভাবে বিভোর থাকতেন। দীর্ঘ ছমাস কাটল এইভাবে।

এই সময় মথুরবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী রোগশয্যায় শায়িত জীবন মরণ সমস্যা। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। মথুরবাবু ভাবলেন সব বুঝি চলে যায়। ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে এসে মথুরবাবু মায়ের মন্দিরে এলেন, তারপর ঠাকুরের কাছে।

উদভ্রান্ত মথুরবাবু। পঞ্চবটীতে ভাবে বিভোর ঠাকুর। উদভ্রান্ত মথুরকে দেখে পরম স্নেহে পাশে বসালেন ঠাকুর।

মথুরবাবু সজলচোখে বললেন, আমার যা হবার তা শেষ হয়ে গেল…আর তোমার সেবা করতে পারব না।

ভাবে মধুর হয়ে ঠাকুর বললেন, ভয় নেই তোমার পত্নী ভাল হয়ে যাবে।

ঠাকুরের কাছে থেকে পরম নির্ভর বাণী পেয়ে প্রাণের মধ্যে পেলেন এক আশার আলো।

মথুরবাবু বাড়ী চলে গেলেন। আশ্চর্য দেখলেন তাঁর স্ত্রী সুস্থ আছেন, ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করলেন। দেখতে দেখতে ঠাকুর তাঁর রোগকে নিজের মধ্যে এনে পেটের রোগও অন্যান্য রোগে ভুগতে লাগলেন। ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর এ ভক্তির জন্যেই ঠাকুর তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

দীর্ঘ ছমাস ধরে ভুগলেন ঠাকুর। মথুরবাবু চিকিৎসার আয়োজন করলেন। এই রোগ-শয্যায় ঠাকুরের সাধনার কোন বিরাম ছিল না। ঠাকুর জেনেছিলেন সমস্ত সাধন ভজনেব সার অদ্বৈতভাব। পরম সত্য, সব শেষ এখানে।

অদ্বৈত সাধনায় ব্রতী হয়ে তাকে জয় করেও ঠাকুরের মন ছিল উদার। সবার চেয়ে বড় মানুষ, সব এক এই বিশাল পৃথিবীর চিরন্তন সত্য ত্যাগ ভালবাসা। এই সময়…একজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ফকির গোবিন্দ রায় তখন দক্ষিণেশ্বরে। যাঁর আশ্রয় স্থান পঞ্চবটীতে। আগে গোবিন্দ রায় ছিলেন ক্ষত্রিয় পরে তাঁর মন ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। ঠাকুর দেখলেন ফকিরকে। আলাপ হয়ে ঠাকুর প্রীতিলাভে ধন্য হলেন। ইসলাম ধর্মে ফকিরের অগাধ বিশ্বাস দেখে ঠাকুরও তাঁর বিশ্বাসে সাড়া দিলেন।

ঠাকুর ভাবলেন, ঈশ্বরকে পাবার এও তো একটা পথ।

তারপব ঠাকুর দীক্ষা নিলেন। ইসলাম ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। সাধনা শুরু হল আর ঐ সময়ে ঠাকুর আল্লা মন্ত্র জপ করতেন, মুসলমানদের মত কাছা খুলে কাপড় পরতেন। নামাজ পড়তে লাগলেন, হিন্দুভাব মন থেকে মুছে ফেললেন। এই সময়ে ঠাকুর প্রথমে এক জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন পেলেন, এই জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন পেয়ে পুনরায় নির্গুন ব্রহ্মে ঠাকুরের মন মিশে গেল।

ছমাস ধরে রোগ ভোগের পর ঠাকুর এবার ফিরে গেলেন কামারপুকুরে।

ঠাকুর এসেছেন কামারপুকুরে। পরিচিতদের মাঝখানে এসেছেন ঠাকুর। সবাই দেখলে এ তো সেই গদাধর, ঠিকই তাদেরই।

ঠাকুরের মনে তখন আরেক মধুর ভাব সমাধি। হৃদয়ের শতদল ফুটে উঠেছে নানা ছন্দে।

ঠাকুরকে দেখেছেন সবাই। কিন্তু কি যেন এক নতুন রূপে এসেছেন, আগের মতো সবই। ঠাকুরকে দেখে মনে হয় যেন এক ভাবমধুর জগতের সন্ধান নিয়ে এসেছেন ঠাকুর।

জয়রামবাটীতে গেল খবর সেখানে অপেক্ষায় আছেন সারদা। সেই সাত বছর বয়সে একবার শেষ দেখেছিলেন ঠাকুরকে, তখন তাঁর বয়স ছিল অল্প। হৃদয় এসেছিলেন মামাকে দেখলে, অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করে ধন্য হয়েছিলেন হৃদয়। আবার ছয় বছর পর ঠাকুরের কাছে এলেন সারদা, তখন তাঁর বয়স তেরো। এ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন ঠাকুর জননী।

শূন্য মনেমন্দিরে অন্তরের দীপ জ্বালিয়ে একমাস ছিলেন সারদা। ফিরে গেলেন। বিরহী মন নিয়ে দেবতাকে না পেয়ে চলে গেলেন।

তারপর এলো ডাক। বিয়ের পর প্রথম এলেন দেব দর্শনে···।

কামারপুকুরে এলেন সারদা। দেবদুর্লভ স্বামীকে দেখলেন পূর্ণ যুবতী সারদামণি। নিজেকে উৎসর্গ করলেন দেবতার চরণতলে দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর এই প্রথম দেখা···ঠাকুর পরম আগ্রহে সারদামণিকে শেখালেন সংসারের নিত্য কর্ম পদ্ধতি, শেখালেন প্রদীপের সলতে পাকানো, ঘর নিকানো, সাঁজের প্রদীপ জ্বালানো, সন্ধ্যারতি, অতিথি-অভ্যাগতের সমাদর জানানো। সারদা আগ্রহে শিখে নিলেন সব।

প্রাণভরে দেখলেন সারদামণি দেবতাকে। অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন এই পরম আরাধ্য দেবতাই তাঁর জীবন পথের আলো। ঠাকুর দিনের পর দিন পত্নীকে শেখালেন জীবন দর্শনের নতুন অনুভূতি।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী এই সময় এইখানেই ছিলেন, ভৈরবী দেখলেন ঠাকুরকে। ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীর ভালো ল্যাগত না। এসব কি? গৃহীর মত ব্যবহার। ভৈরবী সাবধান বাণী করলেন, তোমার পতন হবে সাবধান।

হাসলেন ঠাকুর।

তোতাপুরী জানতেন ঠাকুর বিবাহিত। তাই তোতাপুরী বলতেন, তাতে কি হয়েছে, স্ত্রী কাছে থাকলেও যার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে, সেই তো পেতে পারে পরম ব্রহ্ম ভাল।

সাতমাস ছিলেন সারদা। নতুন আলোর স্পর্শ পেয়েই আনন্দময় জগতের সন্ধান নিয়ে গেলেন সারদামণি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন পরবর্তীকালে তাঁর

সাধক ছেলেমেয়েদের কাছে, "এ সময় সর্বদা অনুভব করতাম আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন হৃদয়ে স্থাপিত হয়েছে।"

কামারপুকুরের মায়া কাটিয়ে ফিরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ফিরে গেলেন সারদা জয়রামবাটীতে। ১২৭৪ সালে ফিরে গেলেন সারদা। গিয়ে অনুভব করলেন নিজের জীবনের গতিকে প্রতিষ্ঠিত করার নীরব সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার প্রেম তাঁর অন্তরের গাঁথা ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে যায়…।

মহাকাল এগিয়ে যায়। যুগদেবতা তাঁর পথের সন্ধানে এগিয়ে চলেন। যত মত তত পথ এই সত্যটুকুকে জাগিয়ে তোলার পবিত্র ব্রত নিয়ে ঠাকুর হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে মহাকালের অনন্ত রহস্যে।

পাগল ভোলা মহেশ্বরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত।

শোনেন সারদা সুদীর্ঘ তিনটি বছর কেটে যায় মৌনতায়, নীরবতার জলতরঙ্গে প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত।

কান পেতে শুনতে পান দেবী সারদা মহাকালের সংগীত। ভাগীরথীর কল্লোল থেকে কি আসবে না ফিরে ভোলে মহেশ্বর? সে কি যেতে পারবে না সেই দক্ষিণেশ্বরে? সেখানে দেবতা রয়েছেন একাই।

এলো সময়। ১২৭৮ সালে ফাল্গুনি পূর্ণিমা, পুণ্যালোভাতুর বাঙালীর গঙ্গাভক্তি আজন্মের।

জয়রামবাটীর পল্লী জননীরাও যাবেন এই পুণ্য স্নানে।

শুরু হল শুভযাত্রা।

তখনকার কালের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই তীর্থপথ ছিল তখনকার দিনে দুর্গম -রেলপথের সুবিধা ছিল না, তাই আসতে হতো পায়ে হেঁটেই। পিতা শ্রীরামচন্দ্র—তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে চলেছেন জননী সারদা। পদব্রজে—জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরের পথে—।

দুর্গম গহন পথকে অতিক্রম করে চলেছেন সারদা জননী, ক্লান্তহীন পথ চলা, প্রচুর শারীরিক কষ্ট করে চলেছেন।

দক্ষিণেশ্বর—ভাগীরথীর কলতান শোনা যায়।

এলেন রাত ৯টায়।

ঠাকুর দেখলেন, বললেন: এসেছো তুমি, এতদিন পরে এলে? সে দিন কি আছে? সেজবাবু নেই, কে তোমায় যত্ন করবে?

সারদামণি দেখলেন, বুঝলেন। কে বলে পাগল? আপন মহিমায় চির উজ্জ্বল।

সেদিন থেকে শুরু হল অপরূপ সাধনলীলা।

এগিয়ে চলে কাল, স্মৃতি, সময়। ঘটনার স্রোতে নতুন রূপে—

গভীর রাত্রি, ঘোর অমানিশার রাত্রি।

সারদা জননী চেয়ে আছেন ভাব সমাধির দিকে। দেখছেন সমাধিমগ্ন দেবমূর্তিকে। ভাবেন কে এই রামকৃষ্ণ? কেই বা আমি?

মা বললেন ঠাকুরকে, আমি তোমার কে?

ঠাকুর প্রসন্ন হেসে বললেন, তুমি আমার মা, আনন্দময়ী মা।

জননী সারদাকে বললেন আরও ঠাকুর, যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরে জন্ম দিয়েছেন, আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন। সাক্ষাত আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সদাই সত্যই দেখতে পাই।

ঠাকুরের এই বাণী কি শুধু একবার, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন ঠাকুর সারদা জননীকে।

এগিয়ে চলে আরও দিন দিন পবিত্র হয়ে ওঠেন ভাবমগ্ন ঠাকুর—সাধিকা সারদাজননী। ঠাকুর বলতেন ও সারদা—সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে।

পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সত্যের সন্ধানে সর্বসাধিকা সারদার অনুভূতি বিশ্বমাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাশক্তির আরাধ্যভূতা শ্রীশ্রীমার জীবন স্রোতের ধারা বহন করেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য চেতনায় নানাভাবে নানা দিক দিয়ে—।

নহবত ঘরে থাকতেন মা। এখান থেকেই সারদা দেখতে পেতেন কত লোক আসছে ঠাকুরের দর্শন লাভে। আর মা এমনও হয়েছে প্রায় মাসাধিক-কাল দেখা নেই ঠাকুরের সঙ্গে। দর্শন লাভেও মা বঞ্চিত।

মা বলতেন, আহা আমি যদি সাধারণ ভক্ত হতাম, তাহলে রোজ ওঁকে দেখতে পেতেম, কাছে বসে কথা শুনতেম।

সারদাজননীর এই আক্ষেপটুকু ছিল মধুরতর, মা বলতেন নিজেই এমনও হয়েছে যে কখনো কখনো প্রায় দু'মাসেও একদিন ঠাকুরের দেখা পেতেন না মনকে বোঝাতেন, বলতেন, মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে ওর দর্শন রোজ পাবি।

দেবী সারদার এই মধুরতর কথাগুলি মধুময় হয়ে বিরাজ করত যেন। তাই

দেখা গেছে—মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে নহবতের দ্বিতল প্রকোষ্ঠ থেকে বেড়ায়।

ফাঁকে চোখ দিয়ে জননী সারদা চকিতের জন্য একবার দর্শন পেতেন ঠাকুরের। তাতেই তাঁর মন তৃপ্ত হয়ে উঠত। আনন্দের পূর্ণঘট বিরাজ করত দিন রাত্রির আবর্তের মাধ্যমে। তাই মা পরবর্তীকালে কথা প্রসঙ্গে বলতেন, ধ্যান করতে দেখা যাবে ঠাকুর কথা কবেন মন যে বাসনাই—তখনই তা পূর্ণ করে দেবেন—কী শান্তি যে প্রাণে আসবে।

ঠাকুর বলতেন মাকে, যখন যেমন, তখন তেমন—যেখানে যেমন, সেখানে তেমন—এই ভাবটি নিয়ে তুমি চলো কারণ আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ ভাবটি যথার্থ সামঞ্জস্য বিধানেই মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারে, প্রশান্তের অধিকারী হতে পারে সর্ব বিষয়ে মমতা ও আসক্তিহীন হতে পারে! শুভাশুভ প্রাপ্তিতে যার আনন্দ বা বিষাদ নেই, তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একদিন ঠাকুর দেখলেন যে তাঁরই পাশে শয্যায় নিদ্রিতা সারদা দেবী। ঠাকুর নিজেকে যাচাই করলেন: মন, এরই নাম স্ত্রীর শরীর, একে পরম ভোগ্য বস্তুই বলে জানে, এবং তার জন্য মন লালায়িত হয়ে ওঠে, কিন্তু ভোগে ডুবে গেলে আর সরে আসা যায় না, পরম ঈশ্বরের করুণা বা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মন তোমার কি চায় স্ত্রীর শরীর না ঈশ্বর? যদি স্ত্রীর শরীর চাও তাই গ্রহণ কর। নিজেকে বিচার করলেন, স্ত্রীকে ছুঁতে গেলেন, পারলেন না। ভাব সমাধির রাজ্যে চলে গেলেন ঠাকুর।

পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ এই লীলা, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে আজও যা ঘটেনি কোন মহাপুরুষের।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। মাস ঘুরে আসে বছর কিন্তু সত্য হয়ে রইলেন ঠাকুর ও সারদা। ব্রহ্মচর্য ও সংযমের পথে ধীর স্থির হয়ে রইলেন তাঁরা।

ঠাকুর বলতেন, সারদা যদি এত ভাল না হত—তা হলে দেহ বুদ্ধি আসত কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

দেব দুর্লভ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিয়ের পর ব্যাকুল হয়ে জগন্মাতাকে বলেছিলেন, মা গো মা, ওর ভেতর থেকে কামভাব দূর করে দে, মা আমার কথা রেখেছেন, ওর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করেও কামনা বাসনা একদিনের জন্য আসেনি।

জীবনের কর্মক্ষেত্রে বিচিত্রতর হয়ে ওঠে নানা রহস্যময় ঘটনা। সে বিচিত্র কাজের পথে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন তা প্রতিফলিত হতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে।

ছায়াছবির মতই দিন এগিয়ে চলে দক্ষিণেশ্বরের মায়াময় লীলা।

আজ স্মরণ পথে দৃষ্টি মেলে উধাও হই আর এক ভাব মধুর জগতে।

যেখানে শতদল ফুটে ওঠে জীবন বেদে। একি প্রহেলিকা না রহস্যময় তাই কেবা জানে!

'ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে—। ঠাকুরের এই দিব্য দৃষ্টি তাঁর নিজের জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। মহাকাল হাসে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক করলেন ষোড়শী পূজা করবেন। এর মধ্যে কি বিরাট রহস্য লুকিয়ে ছিল তাই বা কে জানে?

মনে হয় মহিমাময় রূপে যে মা মন্দিরে বিরাজ করেন তার সঙ্গে আনন্দময়ী মা সারদার কোন প্রভেদ নেই। তাই হয়ত ঠাকুর তাঁর দিব্যদৃষ্টি নিয়ে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের সাধনা অন্তরে পুণ্য তীর্থ দক্ষিণেশ্বরের একান্ত প্রকোষ্ঠে ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠান করে মহামায়াব সার্থক পূজা করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পূজারী। এ কাহিনী শুধু এ দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও তার নজির নেই।

স্মরণের দৃষ্টিপথে ভেসে আসে ১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠেব এক রহস্যময় রজনীতে সুরু হল নতুন ইতিহাস রচনার সূত্রপাত।

নিবিড় গভীর অন্ধকার—কান পেতে শোনা যাচ্ছে ভাগীরথীর কলকল্লোল, আকাশের তারারা, বনের বাতাস—সবই যেন রহস্যময় জগতে চলে গেছে।

কে শোনাবেন আজ নবজীবনের বেদমন্ত্র? কার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে নব দেবস্তুতি? তাই বুঝি আজ দক্ষিণেশ্বর সেও হয়েছে পাগল। তারও রূপ আজ অপরূপ। ধ্যানে তন্ময় পঞ্চবটী। সারা মন্দির আজ রোমাঞ্চিত।

মহামায়া সারদার মুখে চির মধুর হাসি—পরিপূর্ণ মাতৃদেউল আজ নতুন রূপে প্রকাশিত। এদিকে শোনা যাচ্ছে শান্ত মধুর কলস্বনায় মধুর সংগীত। ধূপ সৌরভে বিকশিত। মালা আর পূজার সম্ভারে সজ্জিত। নীরব নিথর ঠাকুরের শয়ন মন্দির। নিস্তব্ধ নবহত ঘর। নিঃশব্দ কালীবাড়ী।

অমাবস্যার তমিস্রায় ঢাকা দক্ষিণেশ্বর।

ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্য আয়োজন। ঠাকুর আজ ভাবে আবেগে বিভোর। মাতৃপ্রেমে সে আজ পাগল হয়েছে। ধ্যান তন্ময়তা বিলীন। মহানিশার গোপন পূজা। কেউ জানে না·· সাক্ষী মহাকাল! ধীরে ধীরে গভীর হয়ে ওঠে তমোময় রাত্রি।

মহামায়া মা সারদা আসেন মন্দির দ্বারে।

কুহেলিবিহিন ঘন অন্ধকারে রহস্যময় জগতের কাছে আজ এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়ে গেল।

মহাকালের তীরে এসে মা আনন্দময়ী সারদা আর মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কি অপূর্ব লীলা।

স্মরণের দৃষ্টি নিয়ে তাকাই, দেখি মা সারদা গিয়ে দেখলেন পূজারী ঠাকুর, তাঁকে বলছেন ইংগিতে, এসো এই তোমার স্থান। ঠাকুরের ইংগিতে সারদা জননী উপবিষ্টা হন দক্ষিণ পার্শ্বের শুভ আলিম্পন মণ্ডিত আসনে।

পূজ্য শ্রীশ্রীমা—আর পূজারী শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আজ ফিরে পেয়েছে তাঁর সা ধকাকে।

তারপর সুরু হল পূজার আয়োজন।

ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হল গুরু গম্ভীর স্বরের ধ্বনি। সে মন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হল সারা বিশ্ব।

ঠাকুর বললেন: "হে কালী, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরা সুন্দরী সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর—এঁর শরীর ও মনকে পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও—প্রকাশিত হও। সর্ব কল্যাণ সাধিত হোক—।"

অনেকক্ষণ ধরে চলে মন্ত্রপাঠ। পুষ্প চন্দনে ভরে ওঠে সারদা মায়ের চরণ দুটি। নিবেদন করলেন ভোগ। ধ্যান তন্ময়তায় সারদা গ্রহণ করলেন পূজা অর্ঘ্য। সমাধিস্থ হলেন সারদা, সমাধিস্থ হলেন ঠাকুর নিজে।

সারা দক্ষিণেশ্বর তখন থমথম, ঠাকুর আর সারদা তখন সমাধির সুপ্ত সায়রে—।

যুগের আদর্শ স্বরূপ এ মিলনের ইতিহাস আমরা দেখতে পাই কৈলাস শিখরে হর পার্বতীর শাশ্বত ও চিরন্তন আত্মিক মিলনের পুনরাবৃত্তি। তারপর রাত্রি তৃতীয় প্রহর কেটে যায়, সাধনার অপরূপ লীলার মাধুর্যে মন নেমে আসে ধরণীর নরলোকে।

ঠাকুর ব্রত অন্তে সারদা মায়ের চরণ তলে নিজেকে নিবেদন করলেন। সকল সাধনার যা কিছু ছিল, জল, মালা, আভরণ বিল্ব পত্রে অঙ্কিত নিজের নাম সব কিছুই পাদপদ্মে নিবেদন করলেন। পাদপদ্ম অঞ্জলি ভরে নিবেদন করলেন মাকে, আর করলেন প্রণাম। শেষ হল মাতৃপূজা…প্রতিষ্ঠিত হল মহামাতৃভাব…।

সমাধি ভঙ্গে সারদা চলে এলেন নহবত ঘরে। ষোড়শী পূজার পর পাঁচমাস

সারদামণি ঠাকুরের কাছে ছিলেন। তারপর ১২৮০ সালের আরম্ভে সারদামণি আবার কামারপুকুরে চলে গেলেন।

এই ষোড়শী পূজার পরেই ঠাকুরের সাধক জীবনের শেষ হয়।

১২৭৪ সালে কামারপুকুর থেকে চলে আসার পর সেই সময়ে মথুরবাবুর ইচ্ছে হল তীর্থে যাবেন। তীর্থের সাথী তাঁর পরিবার। ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এই দুরন্ত বাসনা জানালেন মথুরবাবু। জননী চন্দ্রাদেবী ও ভাগনে হৃদয়কে ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে যাবেন এই কথা জানালেন।

সুরু হল শুভ যাত্রা।

১২৭৪ সালের মাঘ মাস।

ভাগনে হৃদয় এই ভ্রমণ বিষয় নিয়ে বলেছেন, একশো জন লোক সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবু তীর্থ যাত্রা সুরু করলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা ও তৃতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী রিজার্ভ করা হয়েছিল। প্রথমে এলেন বৈদ্যনাথ ধাম। সেখানে থেকে বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন। এই তীর্থ ভ্রমণ কালে দেওঘরে এলেন সবাই। উদ্দেশ্য বৈদ্যনাথ দর্শনের পর কাশী যাবেন। দেওঘরে তখন চলেছে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ঠাকুর দেখলেন। পথে যেতে দীন দরিদ্রের কান্নায় দুঃখে ঠাকুরের অন্তরে তীব্র বেদনা দেখা দিল।

ঠাকুর স্থির থাকতে পারলেন না, বললেন মথুরবাবুকে, সেজকর্তা তুমিতো মায়েরই দেওয়ান। আর এরাও তো মায়েরই সন্তান। দাও এদের একদিন পেট ভরে খেতে, দাও একখানা কাপড় প্রত্যেককে।

ঠাকুরের কথা শুনে মথুরবাবু বললেন, এখন কি করে এত অর্থ পাব? তীর্থে চলেছি। কোথায় কখন কত টাকা লাগে তা তো জানিনে। হাতের টাকা খরচ হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত তীর্থ যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠাকুর শুনলেন, মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ বেদনা বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, তবে আমি আর যাব না। এই আমার তীর্থ। আমার কি হবে তীর্থে গিয়ে? কোথায় গেলে দেখতে পাব দীন দরিদ্র নারায়ণকে? এরাই তো সজীব দেবমূর্তি—

দিব্যদৃষ্টিই পেলেন মথুর। ঠাকুরের নির্দেশ মত দুঃস্থ দীনদের পেটভরে খাওয়ালেন, নগ্ন দেহে দিলেন বস্ত্র।

ভাবে বিভোর হয়ে আনন্দে নাচলেন ঠাকুর, এক হয়ে গেলেন সবার মধ্যে।

আনন্দ ভরা মন নিয়ে সুরু হল পথ চলা। বৈদ্যনাথ দর্শনের পর-তীর্থ

যাত্রীর দল এলেন কাশীতে।

এখানে এসে ঠাকুর পরমতৃপ্তি লাভ করলেন। ঘুরে ফিরে দেখলেন এখানকার সব কিছু। শিবপুরীর আধ্যাত্মিক মহিমা ঠাকুরের নয়নে জাগ্রত হয়ে উঠলো। শিশুর মতন হয়ে গেলেন তিনি।

রোজই পানসীতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতেন। সংগে সংগে ভাগনে হৃদয়। পথে যেতে যেতে ভাবে বিভোর থাকতেন। কেদারনাথের মন্দিরে গেলে ঠাকুর যেন অন্য এক জগতের সন্ধান পেতেন। সাধুদের সংগেও দেখা করতেন। এখানেই তখন থাকতেন শিবাবতার ত্রৈলঙ্গস্বামী। ঠাকুর যেতেন। অনেকবার গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। দর্শনে দু'জনেই দু'জনকে চিনলেন। সে সময়ে স্বামিজী মৌনাবলম্বন করে মণিকর্ণিকা ঘাটে ছিলেন। ঠাকুরের চেহারা ও আকার প্রভৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী হৃদয়কে, দেহে পরমহংস দেবের লক্ষণ আছে, ইনি সাক্ষাত বিশ্বেশ্বর।

তারপর এলেন প্রয়াগে। তিনরাত এখানে ছিলেন। শাস্ত্র অনুযায়ী তীর্থলোভীরা সবাই মাথা কামালেন। ঠাকুর বললেন আমার দরকার নাই।

ফিরে এলেন বারাণসীতে। এলেন বৃন্দাবন ধামে। বৃন্দাবনের স্থান দর্শন করে ঠাকুর অভিভূত হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত বৃন্দাবনের সমস্ত কিছু দেখলেন ঠাকুর। দেখলেন রাধাকুণ্ড ও গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি তীর্থভূমি। ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। নিধুবনে ভক্তিমতী গঙ্গামাতাকে দেখলেন ঠাকুর। চিনলেন ঠাকুর. তারপর দেখা হওয়া মাত্র মনে হল। কত চেনা।

বৃন্দাবন থেকে ঘুরে ফিরে আবার এলেন কাশীতে।

এখানে এসে আবার দেখা পেলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর।

ঠাকুর দেখলেন সেই ব্রাহ্মণী ভৈরবীকে যাঁর কাছ থেকে একদিন নিয়েছিলেন তন্ত্র-সাধন।

এখানে এসে ভৈরবীর দেখা পেয়ে ঠাকুর আনন্দে উথলে উঠলেন। যে ক'দিন ছিলেন প্রায়ই দেখা করতেন ঠাকুর। জীবনের এই শেষ দেখা। ভৈরবী বৃন্দাবন যাত্রার সংগিনী হয়েছিলেন। কাশী ফিরলেন সবাই। কিন্তু ভৈরবী বৃন্দাবনে থেকে যান। ঠাকুর ফিরবার কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মণী দেহত্যাগ করেন।

কাশী থেকে গয়াধামে যাবেন মথুরবাবুর প্রবল ইচ্ছা হল। ঠাকুর রাজী হলেন না। গয়াতেই স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন ঠাকুরের পিতৃদেব। তাই তাঁর নাম গদাধর। গয়ায় গেলে শরীর টিকবে না। ওখানেই চির সমাধি।

ফিরবার সময় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড থেকে নিয়ে আসেন রজ, আর এসেই পঞ্চবটিতে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন : আজ থেকে এ স্থান বৃন্দাবনে পরিণত হলো।

ঠাকুরের এই কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

আবার ফিরে এলেন ঠাকুর।

মনে পড়ে, এই পুণ্য তীর্থ যাত্রায় মণিকর্ণিকার নৌকায় বসে ঠাকুর। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন শ্মশানের চিতা জ্বলছে। নৌকা থেকে নেমে এলেন। একেবারে কিনারে। তারপর ভাব সমাধিতে। এই রহস্যময় ভাবতরঙ্গে কী দেখলেন? ঠাকুর বললেন : আমি দেখলাম পিঙ্গল বর্ণ এক বিরাট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, প্রতিটি চিতার পার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—প্রতিটি শবদেহের কানে তারক ব্রহ্ম নামের সংগীত। আর তার পাশে মহামায়া স্বয়ং মোহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছে। আরও অগ্রসর হই; নিধুবনের সাধিকা মাতা গঙ্গা চিনলেন ঠাকুরকে। পরস্পর যেন কত যুগের। যেন শ্রীরাধিকা ললিতা সখী—মন প্রায় স্থির ঠাকুরের—এইখানেই থাকবেন। হৃদয় বুঝলেন, বললেন মা জীবিত, ঠাকুরের মায়ের কথা মনে হতেই চির জীবনের বৃন্দাবন বাস করার সংকল্প মুছে ফেললেন।

ফিরে এলেন সবাই ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। পুণ্য তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আবার ফিরে এলেন নতুন ব্রত নিয়ে।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার বিনিময়ে শ্রীমায়ের চরণে নিবেদন করেছিলেন সমস্ত সাধনার ব্রত। তারপর বছর না যেতেই খ্রীষ্টানদের পবিত্র ঈশ্বরের কথা ভেবে সেই সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। ধ্যানে মগ্ন, ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনদিন একইভাবে ধ্যানমগ্ন। দর্শন পেলেন দেব মানব ঈশার। তারপর এক-দেহে লীন হয়ে গেলেন। বাইবেল গ্রন্থে যে ঈশার বর্ণনা আছে সে বকম, ঠিক সেই রকমই সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। ঠাকুর বাইবেল পড়ে তা জানতে পেরেছিলেন। মহান সাধনার দ্বারা সফল তিনি হয়েছিলেন জগতের প্রধানতম ধর্মমতগুলিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে। শুধু কি তাই ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ঠাকুর বলতেন ভগবান বুদ্ধ ছিলেন অবতার। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তীর্থঙ্কর, মহাপ্রাণ গুরু নানকের জীবনের প্রতি দৃষ্টি মিলিয়ে তাঁদের দিয়েছিলেন শ্রদ্ধা। তাঁর সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন, এমন একদিন আসবে চির নবীন সন্ন্যাসীর দল, যাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে মায়ের মোহন মন্ত্র। যে মন্ত্রতে ত্যাগ

ও দয়া, করুণা প্রেমের সাগরে এক নতুন বন্যা আসবে।

মথুরবাবুর সংগে তীর্থ যাত্রা শেষ করে চলে আসার পর হৃদয়ের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। সুখের সন্ধানে এতদিন ব্যস্ত ছিলেন হৃদয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বদলে গেলেন। পূজোয় দিলেন মন। পৈতে, কাছা খুলে ফেললেন!

হৃদয় বললেন ঠাকুরকে, তোমার মত আমাকে হতে দাও। তোমাকে আমার করে নাও।

ঠাকুর বললেন, মার যা ইচ্ছে তাই হবে, আমার ইচ্ছায় কি হবে?

হৃদয়ের মনে আসে ব্যস্ততা। কয়েক দিন পর হৃদয় ধ্যান করতে গিয়ে জ্যোর্তিময় দেব দর্শন পেলেন। ভাবমগ্ন হৃদয়কে দেখে মথুর বললেন: হৃদয় আবার কি হল? ঠাকুর বললেন বুঝিয়ে মথুরকে, হৃদয় ঢং করে কিছু করছে না, মাকে ব্যাকুলভাবে ডেকেছিল, তাই এই দর্শন। এবার মা আবার তাকে শান্ত করে দেবেন।

মথুরবাবু বাবু বললেন, ঠাকুর সবই তোমারই খেলা।

এব কয়েকদিন পব ঠাকুব পঞ্চবটীতে চলেছেন। পেছনে হৃদয়রাম হাতে তাব গামছা গাড়ু। যদি দরকার হয়। যেতে যেতে হৃদয় এক অভিনব দৃশ্য দেখলেন, ঠাকুর যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয়, তাঁর দেহ থেকে করুণায় বিগলিত এক অপূর্ব জ্যোতির আলো, আর সেই আলোকে সারা পঞ্চবটী আলোকিত। শুধু কি তাই, ঠাকুর চলেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র পদদ্বয় যেন শূন্যে। হৃদয় ভাবলেন হয়ত ভুল, হয়ত স্বপ্ন। কিন্তু তা নয়। বারবার সেই অপরূপ দর্শন। হৃদয়ের মন ও দেহে আনন্দের বন্যা, তাঁর মনে হলো তিনিও জ্যোর্তিময় হয়েছেন। মনে হলো এ দেহ ঐ জ্যোতির অংশ স্বরূপ। এতদিন চিনেও চিনেনি সে। মনে হলো হৃদয়ের শুধু তাঁর সেবার জন্যই এই আলাদা দেহ। নইলে একই সব। এই ভাবে অভিনব দশনে, ও নিজের জীবনের এই রহস্য বুঝতে পেরে হৃদয় ভুলে গেলেন সব। চেতনা হারালেন, আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, বললেন হৃদয়, ও রামকৃষ্ণ ও। রামকৃষ্ণ আমরা মানুষ নই, নামরা কেন এখানে? চল আমরা দেশে দেশে ঘুরি। জীবের মঙ্গল করি—তুমি যে আমিও সেই।

ঠাকুর হৃদয়কে নিরস্ত হতে বললেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তখন বাধ্য হয়েই হৃদয়ের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'দে-মা শালাকে জড় করে দে'। বলার সংগে সংগে হৃদয় আবার আগের মত হয়ে গেলেন।

হৃদয় দেখলেন সে যেন আগেরই মতন, কোথায় সেই আনন্দ? বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন : মামা একি করলে তুমি? কেন জড় হতে বললে?

ঠাকুর বললেন, আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি, তুই এখন স্থির হয়ে থাক এই কথা বলেছি। সামান্য দর্শনে তুই ব্যস্ত হয়ে উঠলি, গোলমাল করলি। তার জন্য এমন করলাম। সময় যখন হবে তখন আরও কত দেখবি!

অভিমান আর অহঙ্কারে হৃদয় জ্বলে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, যেমন করে হোক আবার আমাকে আগের মত হতে হবে। আবার সুরু করলেন ধ্যান, জপ, পূজো। পঞ্চবটী তলে গিয়ে ঠাকুরের মতন তাকে হয়ে যেতে হবে। এই ভেবে সাজালেন নিজেকে। গভীর রাত্রি। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের আসনে হৃদয়রাম। ঠাকুরও আসছিলেন। ওখান থেকেই ঠাকুর শুনতে পেলেন হৃদয়রামের চিৎকার, মামা গো পুড়ে গেলাম, পুড়ে গেলাম।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে বললেন, কি হয়েছে তোর? কি হল আবার?

হৃদয় বললেন : মামা এইখানে এসে ধ্যান করছিলাম, কে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দিল। কি অসহ্য যন্ত্রনা।

ঠাকুর তার হাত স্পর্শ করলেন। পরম স্নেহে ভাগ্নের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, যা সব ঠিক হয়ে যাবে রে। তুই কেন এ রকম করিস, তোকে বলেছি আমার সেবা করলেই সব হবে।

শান্ত হলেন হৃদয়। পরম বিশ্বাস নিয়ে স্থির হয়ে রইলেন তিনি।

সিয়রের বাড়ীতে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন হৃদয়রাম, বললেন ঠাকুরকে মামা তোমাকে যেতে হবে সিয়রে।

এদিকে মথুরবাবুর বাড়ীতেও পূজো। ঠাকুরকে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন মথুরবাবু। ঠাকুর ওই অনুরোধে রাগ করলেন।

মথুরবাবু হৃদয়কে অর্থ সাহায্য করলেন। ঠাকুর ভাগ্নেকে বললেন : তুই দুঃখ করছিস কেন, আমি রোজই সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজো দেখতে যাব। আমায় কেউ দেখতে না পেলেও তুই দেখতে পাবি।

ঠাকুরের নির্দেশমত হৃদয় পূজোর আয়োজন করলেন। সপ্তমীর রাতে দর্শন পেলেন হৃদয়, দেখলেন ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে দণ্ডায়মান। প্রতি দিনই দেখা দিলেন ঠাকুর। সন্ধিপূজা শেষ। তারপর একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, তুই তিন বছর পূজো করবি।

ঠাকুরের কথা না শুনে চতুর্থবার পূজো করতে গিয়েছিল হৃদয়, কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি, ঠাকুরের কথাই সত্য হয়েছিল।

১২৭২ সালে ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমারের পুত্র অক্ষয় ১৭ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুরোহিতের পদে। ঠাকুর তাঁকে ভালোবাসতেন। ঈশ্বর প্রেমিক অক্ষয়কে স্নেহ দিয়ে মনের মত গড়েছিলেন ঠাকুর। অক্ষয়ের বিয়ের কথা চলছিল। ১২৭৬ সালে অক্ষয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কয়েক মাস পর শ্বশুরবাড়ীতে অক্ষয়ের কঠিন রোগ দেখা দেয়। বাড়ী ফিরে অক্ষয় সুস্থ হবার পর দক্ষিণেশ্বরে এলেন। আবার রোগশয্যায় পড়লেন অক্ষয়। ঠাকুর এর আগেই বলেছিলেন, এ লক্ষণ বড় খারাপ।

ঠাকুরের কথাই মিলে গেল বর্ণে বর্ণে। অক্ষয় দেহত্যাগ করলেন। ঠাকুর কান্নার সাগরে বিলীন হলেন, আবার কখনও ভাবে হাসতে সুরু করলেন। হাসি-কান্নায় ব্যথা-বেদনায় ঠাকুর ডুবে গেলেন—।

এর কয়েকদিন পর মথুরাবাবুকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন তাঁর জমিদারীর জায়গায়। সেখানে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন নিরন্ন দুঃখীদের। তাদের সেবা করলেন।

ঘুরতে ঘুরতে—এলেন শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল নবদ্বীপ কালনায়। মিলিত হলেন ভগবানদাস বাবাজী নামে সিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে।

মনে পড়ে একটি ঘটনা—

কলুটোলা ষ্ট্রীটের একটি হরিসভায় ঠাকুর গিয়েছিলেন। সঙ্গে হৃদয়। ভাগবৎ পাঠ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর। ঠাকুর দেখলেন তাঁর মানস দৃষ্টি নিয়ে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যেন তাঁর সামনে। মহাপ্রভুর সংগে ঠাকুরও যেন অপরূপ ভঙ্গিমায় রত। শ্রীচৈতন্যদেবের আসনের 'পর দাঁড়িয়ে ঠাকুর ভাবে মগ্ন। সংকীর্তনে যোগ দিয়ে ভাবে বিভোর।

ঠাকুরের এরূপ দৃশ্য দেখে সবাই বিস্মিত। আর ঠাকুর কলুটোলায় এসে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। ভাবের হাটে প্রেমের বন্যা। সভাভঙ্গে চলে গেলেন ঠাকুর ভাবসাগরে ডুব দিয়ে। তারপর সভামধ্যে কলগুঞ্জন। কেউ বিরুদ্ধে! কেউ সপক্ষে। ঘুরতে ঘুরতে কথাটা ভগবানদাসজীর কাছে গেলো। বিস্মিত হয়ে উঠলেন তিনি, কে এই পাগল অনামী শ্রীরামকৃষ্ণ? কোন সাহসে শ্রীচৈতন্যদেবের শূন্য আসনে বসেছেন? সাবধানবাণী শোনালেন।

কিন্তু ঠাকুর কিছুই জানলেন না এ সবের।

এবার এসেছেন কালনায় ঠাকুরকে নিয়ে মথুরবাবু, সঙ্গে হৃদয়।

ঠাকুর এলেন। দেখলেন ভগবানদাস বাবাজীকে, অহঙ্কারে পূর্ণ তাঁর মন। সর্বত্র যেন তাঁর আত্মমহিমা।

ঠাকুর বললেন দীপ্তকণ্ঠে: এত অহংকার? লোক শিক্ষা দেবার কে তুমি?

ভগবানদাস বাবাজী তাঁর এক শিষ্যকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তোর কণ্ঠি ছিঁড়ে ফেলব। ঠাকুর তাই দেখেছিলেন।

ঠাকুরের কথা শুনে বিস্মিত দাস বাবাজী। দেখতে দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত অহঙ্কার ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। ভগবানদাস বাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দে বিস্মিত হয়ে উঠলেন। শ্রদ্ধায় বিচলিত হয়ে কলুটোলার ঘটনাটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে কালের ডাকে মথুরামোহন দেহত্যাগ করলেন।

মনে পড়ে ঠাকুর বলেছিলেন মথুরবাবুকে, মথুর যতদিন তুমি থাকবে, আমি তো ততদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকব।

মথুরামোহন চমকে উঠলেন, বলেছিলেন, তা কেন বাবা। আমার স্ত্রী ও ছেলে রয়েছে, তারাও তোমাকে ভক্তি করে—।

ঠাকুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বেশ তোমার আশাই পূর্ণ হবে। ঠাকুর তাই করেছিলেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে চলে যান মথুরামোহনের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুর পর।

একদা মথুরবাবু বলেছিলেন: এই পদধূলি নিয়ে ভবসিন্ধু পার হব।

কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেলেন মথুরামোহন। মৃত্যুর দিনে ঠাকুর দেখা দিলেন। হৃদয়কেও পাঠালেন। কিন্তু ঠাকুর সমাধিতে লীন হয়ে জ্যোতির্ময়রূপ ধরে চির ভক্তপ্রাণ মথুরামোহনের কাছে চলে গিয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গ শেষে হৃদয়কে বলেছিলেন ঠাকুর: মথুরকে রথে করে নিয়ে গেছেন মায়ের সাথীরা।

গভীর রাত্রিতে খবর হল পাঁচটার সময় মথুরামোহন দেহত্যাগ করেছেন।

মথুর চলে গেলেন! রেখে গেলেন একটি অদ্ভুত আদর্শ, প্রথম দেখেছিলেন পাগল গদাধর, আত্মভোলা সাধকরূপে—তারপর দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে অনুগত ভক্তের মত ঠাকুরের সেবা করে এসেছেন। ঠাকুরও স্নেহ করতেন।

মনে পড়ে, ১২৭৮ সালে যখন সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তখন মথুরামোহন অমরলোকে।

ঠাকুর তাই বলেছিলেন সারদাকে, এতদিন পরে এলে? সেজবাবু নেই। কে তোমাকে সেবা যত্ন করবে।

ঠাকুরের এই কথার মধ্যেই দেখতে পাই চির বাঁধনে বাঁধা ভক্ত আর ভগবান।

এগিয়ে চলে ঠাকুরের অভিনব দর্শন আর নিত্য আসেন ভক্ত সাধকের দল। ঠাকুরের মুখে অমৃতময় বাণী পান করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে তারা। ঠাকুর তাদের কাছে, সহজ ও সরল হয়ে যেতেন। বলতেন: আমি কে? ঈশ্বরই সব। পরমপুরুষের প্রভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে আগামীকালের পথের নিশানা।

১২৮০ সালের কার্তিক মাসে সারদা দেবী যখন কামারপুকুরে ছিলেন, তখন ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বর পরলোকগমন করেন। রামেশ্বর ছিলেন, উদার ও সরল। তাঁর মৃত্যু সংবাদ যখন দক্ষিণেশ্বরে এলো তখন ঠাকুরের ভাবনা হলো মা চন্দ্রা দেবীকে কেমন করে জানাবেন এই নিদারুণ শোক সংবাদ।

পরে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন যেন জননী এই শোক সহ্য করতে পারেন।

এলেন মায়ের কাছে, বললেন ঠাকুর। ঠাকুরজননী চন্দ্রাদেবী সব শুনে বললেন, সংসার অনিত্য! শোক করে কি লাভ?

এই চিরন্তন কালহীন স্রোতে ১২৮৩ সালে ঠাকুরজননী চন্দ্রাদেবী ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন—। জননীর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুর তাঁকে সেবা করে গিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক এর পরেই দেহত্যাগ করলেন। শম্ভুচরণ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে নতুন জীবন লাভ করেন। রোগশয্যায় থাকার সময় শম্ভুকে দেখতে এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে হৃদয়কে বললেন শম্ভুর বাতির তেল ফুরিয়ে গেছে।

সাধনজীবনের আলোচনায় মনে হয়, ঠাকুর আগামীকালের ইতিহাসে এক নতুন রূপে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এগিয়ে এলেন ঠাকুর জ্ঞানের আলোর দীপ্তি নিয়ে। এলেন গৌরী পণ্ডিত ঠাকুরের কাছে গৌরী পণ্ডিত ছিলেন দাম্ভিক তার্কিক অভিমানী।

ঠাকুর হাসলেন। দেখতে দেখতে গৌরী পণ্ডিতের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। গৌরী পণ্ডিত বুঝলে জীবনের সব চেয়ে বড় যে পথের নির্দেশ, সেই নির্দেশ পেলেন ঠাকুরের কাছ থেকে। পরম শান্তিতে গৌরী পণ্ডিতের দিন যায়। গৌরী পণ্ডিত বিদায় চাইলেন। ঠাকুর বললেন, কোথায় যাবে তুমি?

সজলনেত্রে বললেন গৌরী পণ্ডিত, আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঈশ্বরকে পাই, বৈরাগ্যের আগুনে আমি যেন নিজেকে চিনতে পারি।

গৌরী পণ্ডিত চলে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সংসার যদি আবার তাকে ডাকে, নিয়ে যায় সেই কর্মকোলাহলে, তাহলে? তাই গৌরী পণ্ডিত চিরদিনের জন্য হলেন নির্বাসিত এক আনন্দময় জগতের সন্ধানে।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে ঠাকুর দেখতে গেলেন। ফিরে এসে বললেন ঠাকুর, শক্তি আছে, কিছু করব, এমন একটা ভাব।

ঠাকুর যখনই পেতেন কোন পণ্ডিত বা কোন গুণীর সন্ধান, নিজেই ছুটে যেতেন তাঁদের কাছে। নানারকমভাবে ঠাকুর দেখেছেন তাঁদের। প্রেমের বিকাশ ফুল ফুটিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর।

পণ্ডিত পদ্মলোচন স্বামী এসেছেন কলকাতায়। ঠাকুর সংবাদ পেয়েই তাঁর কাছে গেলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁরা মুগ্ধ হলেন। ঠাকুরের মুখে নাম গান শুনে পদ্মলোচনেরও ভাব সমাধি। দু'জনেই তখন ভাব সমাধির তীরে। পণ্ডিত পদ্মলোচন বললেন, এই সেই পরম পুরুষ, পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি জগতের কল্যাণে এসেছেন এ ধরণীর বুকে—। ভক্তের ডাকে ছুটে গিয়েছেন যুগ শ্রেষ্ঠ! নারায়ণ শাস্ত্রী যাঁর জ্ঞানের গরিমায় দীপ্তভঙ্গিমা। যিনি কাশীতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কাটিয়েছিলেন জ্ঞানলোকে। এসেছিলেন নবদ্বীপে জ্ঞানের বিকাশে। এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। দেখলেন ঠাকুরকে, দেখলেন যেন এই তো সেই তাঁর আরাধ্য দেবতা যার আদি অন্ত কিছুই নেই। নারায়ণ শাস্ত্রী এতদিনে বুঝলেন এই সেই সুধা-সমুদ্র যাঁর মুখে মধুর নাম। ঠাকুরও দেখলেন তাঁকে। উভয়েই শাস্ত্র সাগরে ডুবে গেলেন। শাস্ত্রী ঠিক করলেন: সবই তুমি, তোমার কাছেই আমি থাকব ছায়ার মতন।

একদিন মাইকেল মধুসূদন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। মহাকবি এসেছেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আছেন নারায়ন শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী মশাই চলে গেলেন স্বধর্ম ত্যাগী খ্রিষ্টান মাইকেল মধুসূদনকে দেখে। অন্তরের ঠাকুর আলোকিত হয়ে উঠলেন। পরম পুরুষ বললেন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন, ভগবৎ ভক্তিই একমাত্র সার। কবিকে শোনালেন গান। নামে গানে মৌনতায় মুগ্ধ হয়ে কবি নিলেন বিদায়। ঠাকুর দিলেন তাঁকে প্রেমপূর্ণ প্রীতি।

নারায়ণ শাস্ত্রী কিছুদিন পর ঠাকুরকে বললেন, দীক্ষা দিন। ঠাকুর বুঝলেন এই তো সময়। দিলেন দীক্ষা। সন্ন্যাস পেয়ে শাস্ত্রী গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে চিরদিনের জন্য চলে যান।

গুরু ভাবের অদম্য শক্তির প্রেরণায় ঠাকুর নিজেকে ও অন্যকে চেনালেন

অন্তরের আলো দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগলীলায় এক বিশেষ যুগকে দেখেছেন।

অক্ষয় হয়ে আছেন তাঁর কাজ ও তাঁর বাণীতে। 'সকল ধর্মের সার এক' এই মহাজাগরণের বাণী শোনালেন ঠাকুর।

।

ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটল ঠাকুরের। এই সময় ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল আরেকটি ঘটনা।

ঠাকুরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাত।

মহাকালের গতিতে আরেক উজ্জ্বল ইতিহাস। নব্য বাঙলার যুগে এক যুগলীলার ডাকে তারপর একে একে এলেন কত যুবক, কত সন্ন্যাসীরা।

নবযুগের জাগরণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঠাকুরের যোগাযোগ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন: কেশব আসবার পর থেকেই তোদের মত ইয়ং বেঙ্গলরা এখানে আসছে।

পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন, ডাকলেন ভাবী কালের ভক্ত, সাধক সন্ন্যাসীদের, তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না।'

সার্থকভাবে সমস্ত সাধনার অন্তে ঠাকুরের প্রাণ জেগে উঠত তাদের জন্যে যারা আসবে তাঁর কাছে তিনি তার মনের মাধুরী দেবেন উজাড় করে।

নব জাগরণের পটভূমিকায় একটি আশ্চর্য শিক্ষা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

১২৮১ সালের চৈত্র মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণে বাসনা জাগল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে দেখার। তাঁকে সংগে নিয়ে এলেন ভাগ্নে হৃদয়। বেলঘরিয়াতে তখন কেশব সেন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেন কেশবচন্দ্র। দেখা মাত্রই অনুভব করলেন এ যেন এক বিরাট মহাপুরুষ। ঠাকুরও কেশবচন্দ্রকে মুক্তির বাণী শোনালেন। প্রথম দর্শনেই বিভোর কেশবচন্দ্র। তিনি কেশবকে দেখা মাত্রই বললেন: বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বরের দর্শন করে থাক, কিরূপে দর্শন কর তাই জানবার জন্য এলাম। তিনি আরও বললেন। 'কে জানে কালী কেমন—ষড়দর্শনে না পায় দর্শন।' বলতে বলতে মধুর কণ্ঠে তিনি গান গাইলেন। তারপর সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। কেশবচন্দ্র ও সমবেত ব্রাহ্ম যুবকরা ভাবলেন পাগল, নয়ত ভেলকি বাজি। তারপর সমাধি ভঙ্গে তিনি জাগলেন, ঠাকুরের সারা চোখে মুখে স্বর্গীয় ভাব। কেশবচন্দ্র বিস্মিত হলেন। সুরু হল কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তা।

মন্ত্র মুগ্ধের মতন শুনছেন কেশবচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যরা। দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে গেল। যাবার সময় তিনি বললেন কেশবকে, দেখ, ব্যাঙাচির যত দিন লেজ থাকে, ততদিনই তার স্থান জলে, ডাঙায় উঠতে পারে না—ঠিক তেমনি মানুষের যতদিন না অবিদ্যার লেজ খসে ততদিনই সে সংসারের সাগরে ডুবে যায়।—কেশব তোমার মন এই ভাবেই চলছে—।

ঠাকুরের কণ্ঠে মধুর বাণী শুনে সেদিন চমকে উঠলেন কেশবচন্দ্র। বুঝলেন ইনি একজন মহামানব ও সাধক সন্ন্যাসী যিনি মুক্তিকামী মানুষের জগৎ গুরু।

ঠাকুরের প্রভাবে কেশবচন্দ্র পেলেন এক নতুন জীবন দর্শন। ঠাকুরকে দেখার আকুলতায় মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল। ক্রমশ, ঘন ঘন নিত্য দর্শনে কেশবচন্দ্র এক নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। ঠাকুরের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র তাঁর পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে নববিধান নামে, নতুন ভাবে এক ধর্মমত সৃষ্টি করলেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন ব্রাহ্ম। ঠাকুরের দর্শন পাবার পর থেকেই বিজয়কৃষ্ণ পেলেন অন্তরে নতুন আলোর শিখা। ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে অন্য সাধনায় এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এঁর দেখাদেখি অনেকেই দল ছেড়ে দিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা—। দক্ষিণেশ্বরে আসলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনিও যখন বুঝলেন ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ দল ছেড়েছেন তখন আর দক্ষিণেশ্বরে এলেন না তিনি। ঠিক এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনুরাগী নরেন্দ্রনাথ তখন দিকভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সাধারণ সমাজে যোগ দিলেন তিনি।

দেখতে দেখতে কেশবচন্দ্রের দ্বারা ঠাকুরের পরিচয় পেলেন সাধারণ মানুষেরা। কেশবচন্দ্রের কাগজে লেখা সুরু হল ঠাকুরকে নিয়ে। লিখলেন ঠাকুর সম্বন্ধে। কেশবচন্দ্রের কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবাইয়ের। সুরু হল আগমন কয়েক জনের। এর মধ্যে থেকে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ভক্তদের মধ্যে দেখা গেল রামচন্দ্র ও মনোমোহনকে দুজনেই শিক্ষিত। রামচন্দ্র ছিলেন ডাক্তার ও মনোমোহন ছিলেন তার ভাই ও বন্ধু। দুজনেই ক্রমশঃ ঠাকুরের প্রভাবে এক নতুন পথে এলেন। তারপর এলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—এঁদের বন্ধু। আর সুরেন্দ্রনাথের গৃহেই প্রথম যুবক নরেন্দ্রনাথ দর্শন পান ঠাকুরের, সেই ইতিহাস চিরজয়ী হয়ে রয়েছে।

ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দই সর্বপ্রধান। রাখাল ছিল তাঁর

আরেক নাম, সন্ন্যাসী জীবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। রাখালকে ভালোবাসতেন ঠাকুর। রাখালও। তারপর এলেন নরেন্দ্রনাথ। সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন ঠাকুরকে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। আর সেই আসার সূত্র ধরে আরেক রহস্যতীরে এলেন ঠাকুর, দেখলেন তরুণ নরেন্দ্রনাথকে।

স্মরণের দীপ জ্বালাই; মনে পড়ে ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন তাই আনন্দের আয়োজন। ঠাকুরকে গান শোনাবে কে? কেই বা সে? মনে পড়ল ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের তিনি ডেকে নিয়ে এলেন নরেন্দ্রনাথকে। সুকণ্ঠ গায়ক প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথকে দেখলেন ঠাকুর। একই আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ভজন গাইলেন নরেন্দ্রনাথ, 'মন চল নিজ নিকেতনে' ঠাকুর বললেন যাবার সময়, একবার দক্ষিণেশ্বরে আসিস।

ঠাকুরের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রথম পরিচয়। ঠিক এই সঙ্কটকালে নরেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন এক ঘন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে। ঈশ্বর আছে কি নেই, সত্যকারের জীবন কি? তারই জন্যে জীবনের হাহাকার। সত্য লাভের জন্য ব্রাহ্ম সমাজে গেলেন। কিন্তু সংশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলতেন নরেন্দ্রনাথকে, ধ্যান করো, ধ্যানেই তোমার শান্তি। তবুও না। শান্ত হয় না মন। ভুলে যান ঠাকুরের কথা। দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা।

একদিন বললেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত, ঠাকুরের পরম ভক্ত। বললেন, যদি সত্যই প্রকৃত সত্য লাভ চাও, তাহলে চল দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের কাছে গেলে পাবে সত্যকারের পথ।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ সংশয় ঘেরা মন নিয়ে এলেন ঠাকুরের কাছে। পবিত্র তীর্থভূমি দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে—। ঠাকুর বললেন ভাবে বিভোর হয়ে—নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে ঠাকুর বললেন, তুই এতদিন পরে এলি আমার কাছে? কেমন করে ভুলে ছিলি আমায়? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথ চেয়ে আছি। ওরে নরেন বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ পুড়ে গেছেরে। আজ থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেলাম। ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। সংশয় আর সন্দেহ নিয়ে। গভীর রহস্যতায় ভাবমগ্ন ঠাকুর। ফিরে এলেও নরেন্দ্রনাথের মনে এলো এক নতুন বেদনা। তাঁর বিচার, বুদ্ধি সমস্ত কিছুই যেন লোপ পেতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলেন যাচাই না করা পর্যন্ত ঠাকুরকে মহাপুরুষ বলে মানব না।

কিন্তু তাতেও কি মন গলে। কিসের আকর্ষণে ছুটে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে? কিংবা সংশয়চিত্তে গিয়ে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিতেন। আবার ঠাকুরের কাছে গেলেও ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতেন নরেন্দ্রনাথ। ঈশ্বর কি? তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল। ছুটে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। সেখানেও পেলেন না জবাব। সারারাত জেগে রইলেন। আর সেই বিনিদ্র রাতে পেলেন আশার আলো। নয়নে উদ্ভাসিত হলো ঠাকুর, আর পুণ্য তীর্থ দক্ষিণেশ্বর। সংশয় দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা না করে শান্তি পেতেন না নরেন্দ্রনাথ।

একদিন নরেন্দ্রনাথ আর অন্যান্য ভক্তেরা বসে আছেন।

ঠাকুর বললেন তুই যদি আমার কথা না শুনবি তা হলে এলি কেন? নরেন বলেন, আপনাকে ভালবাসি তাই, ঠাকুর আবার একদিন বললেন, নরেন তুই না এলে আমার কি হবে? তোকে না দেখে থাকতে পারিনে।

এমনি এক সংশয় সন্দেহ নিয়ে দুলছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর তা বুঝতে পেরেছিলেন।

আরেকদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা যা ইতিহাসের পাতায় লেখা হল নতুনভাবে। নরেন্দ্রনাথ আর অন্যান্য ভক্তবৃন্দেরা বসে আছেন।

ঠাকুরও আছেন। ঠাকুর বললেন নিজেকে দেখিয়ে: এর (স্বদেহের) ভিতর যেটা রয়েছে সেটা শক্তি, ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর যেটা রয়েছে সেটা পুরুষ। ও আমার শ্বশুর ঘর।

ঠাকুরের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। সামনে সুবিশাল গঙ্গা। দিন ফুরিয়ে গেছে। সন্ধ্যাকাশে যেন অপরূপ হয়ে উঠল সেই গঙ্গা। ভক্তবৃন্দের সঙ্গীত সাধনায় নীরব হয়েছে দিবাবসান। সন্ধ্যার ক্ষীণ ছায়া। দেবালয়ের আরতি ঘণ্টা বাজেনি তখনও। নরেন্দ্রনাথের দিকে এক দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন। সহসা এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ঠাকুর আসন থেকে উঠে তাঁর স্কন্ধে হাত স্থাপন করলেন। আর তখনই নরেন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য ভাবাবেগ দেখা দিল। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করলেন তিনি যেন নিজেকে তার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে কেবল তিনি একা, কেউ নেই, অবশেষে আমিত্ব বিলীন হয়ে গেল।

একি প্রহেলিকা। কী অপার মহিমা। নরেন্দ্রনাথ ভয়ে ভাবনায় চিৎকার করে উঠলেন; বললেন, ওগো তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন। ঠাকুরের মমতাময় স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন স্বাভাবিক

অবস্থায়। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন যেন দেবমানব তাঁর সামনে। সহসা কি আশ্চর্য পরিবর্তন।

আত্ম বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের সমস্ত গর্ব চূর্ণ হয়ে গেলো। মনে হলো যেন আশীর্বাদে সে আজ ধন্য।

কেশবচন্দ্রের পর নরেন্দ্রনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কেশবের মধ্যে যে একটা শক্তি আছে, আর নরেনের আছে আঠারোটা। উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ পতাকাতলে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

গুরু রূপে বরণ করে নেওয়ার আগে চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল নরেন্দ্রনাথকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু ঘটে। সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথের সুরু হল নবজন্ম। পিতা কিছুই রেখে যায়নি। চিন্তিত হয়ে উঠলেন নরেন। সংসার সম্বন্ধে চির উদাসীন নরেন্দ্রনাথ দারিদ্রের কঠোর স্পর্শে চমকে উঠলেন। দিন যায়। একদিন নরেন্দ্রনাথকে দেখার জন্য ঠাকুর ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ গেল না। অভাব অনটন আর নিয়ত এই অশান্ত মনের যন্ত্রণা তবুও নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই আয়নার প্রতিচ্ছবি। তরুণ নরেন্দ্রনাথের মনে দেখা দিল বিদ্রোহ, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মহান তাঁর লক্ষ্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ।

ঠাকুর এসেছেন কলকাতায়। নরেন্দ্রনাথও ছুটে গেলেন। ঠাকুরের সংগে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে আসার পর একটা অদ্ভুত আশার বাণী নিয়ে এলেন। ঠাকুর রহস্যময় উন্মাদ নন, তিনি প্রকৃত পরমাদর্শ গুরু পিতা সব।

দক্ষিণেশ্বরে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর বললেন, জানি তুই মায়ের কাজের জন্য এসেছিস। সংসার তোর জন্য নয়।

তবুও নিয়ত সংসারের দারিদ্রতায় নরেন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে, বললেন, ঠাকুর যাতে আমার মা, ও ভাই-বোনদের খাওয়াতে পারি তার জন্য মাকে বলে দিন।

নরেনের কথায় ঠাকুর বললেন, ওরে নরেন মার কাছে কোন দিনই কিছু আমি চাইনি, তবে তোদের জন্য চেয়েছি যদি একটু সুবিধা হয়। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না, তাই তোর কথায় মা কান দেন না।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা শুনে চমকে উঠলেন। ভাবলেন মূর্তি-পূজা বিরোধী নরেন্দ্রনাথ কি করবেন? ঠাকুর বললেন, মায়ের কৃপা ছাড়া কিছুই হবে না। আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি তাই মা দেবেন।

নরেন্দ্রনাথের মনের সংশয়, তবুও বিশ্বাস থাক আর নাই থাক ঠাকুরের কথার সত্যতা তাঁকে প্রমাণ করতেই হবে।

কিন্তু কি চাইলেন নরেন্দ্রনাথ তার বিনিময়ে কি পেলেন? সংশয় চিত্তে কালীঘরে গেলেন। তিনি দেখলেন জগন্মাতার আশ্চর্য ভুবন মোহন রূপে এই প্রাঙ্গন আলোকিত হয়ে উঠেছে। এ যেন সজীব মূর্তি, যেন জীবন্ত! তবে কি সমস্ত তার ভুলের মাশুলে ভরা। নরেন্দ্রনাথ ভুলে গেলেন সব, তাঁর আজন্ম বৈরাগ্য প্রবণ মন, অন্ন-বস্ত্রের জন্য কেমন করে প্রার্থনা করবেন। তিনি সব ভুলে গিয়ে বললেন, মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও। জ্ঞান দাও ভক্তি দাও। যেন তোমার কৃপায় সব সময়ই তোমাকে দেখতে পাই।

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন, কিরে চাইলি? নরেন্দ্রনাথ চুপ। ঠাকুর বললেন, যা যা চেয়ে নিয়ে আয়।

নরেন্দ্রনাথ আবার গেলেন। একবার নয়। বার বার তিনবার। গিয়ে সেই একই কথা। "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও, যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই তোমাকে দেখতে পাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তুই যখন চাইতে পারলি নে তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তবে তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।

দিন বদলের পালা শেষ। পরম পুরুষের স্নেহে ও করুণায় ধন্য হলেন নরেন্দ্রনাথ। সাধক তরুণ নরেন্দ্রনাথকে ঘিরে পরম পুরুষের এগিয়ে চলার ছন্দ। আর তারই সুরে মৌমাছির মত কলগুঞ্জন, এলো তার কাছে আরও অনেক সন্তান যাঁরা পরবর্তী জীবনে 'মা' 'মা' বলে সমস্ত জগতের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

পরমপুরুষ দেহত্যাগের আগে নরেন্দ্রনাথের ওপর দিয়ে যান তাঁর ছেলেদের। ঠাকুর বলেছিলেন, নরেন আমার সব ছেলেরা রইল, তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, ওদের রক্ষা করিস, আমি তো চলে যাচ্ছি।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে সবাই। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন, কাছে ডেকে, বাবা আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলাম।

"যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ" এই সেই রামকৃষ্ণ সেই বাণী নিয়ে তরুণ সাধক এগিয়ে চলেন তার কাজে, বীর সাধকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে: 'জয় রামকৃষ্ণ'।

মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত—মনে রেখো এই আমাদের একমাত্র সাধনা—ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ঠাকুর তাঁর জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁরই অনুসরণ করবো।

ঠাকুরের মুখে তাঁর মধুর বাণী শুনবার জন্য যে সব যুবকরা এসে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াতলে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, পরবর্তী জীবনে তাঁরা সবাই সন্ন্যাসী হয়ে জীবনের মহান উদ্দেশ্যকে সফল করেছিলেন।

কয়েকজন সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের সামান্য পরিচয় তুলে ধরছি পাঠকদের কাছে।

হাওড়া জেলার কোন এক গ্রাম থেকে পিতৃ-মাতৃহীন লাটু মহারাজ এলেন কলকাতায়। রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে কাজ করতেন লাটু মহারাজ।

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, আর বাড়ী গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতেন। অধীর আগ্রহে শুনতেন লাটু। ঠাকুরকে দেখার প্রবল বাসনায় একদিন গোপনে যায় লাটু। গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের দর্শন পেলেন। ঠাকুর পরম স্নেহে তাকে বসালেন। ক্রমশ পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লাটু ঠাকুরের সেবার ভার নিলেন। ঠাকুরের রোগশয্যায় লাটু সেবা করছিলেন অসীম ধৈর্য্য সহকারে। গুরুভাইরা তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। গুরু ছাড়া তাঁর অন্য কিছু চিন্তা ছিল না। সরল সুন্দর এই লাটুর প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলতেন: তোমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় চাও তাহলে তোমরা লাটুর দিকে তাকাও। পরবর্তী জীবনে লাটুমহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'স্বামী অদ্ভুতানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাখাল চন্দ্র ঘোষ নামে এক যুবক ঠাকুরকে দেখার জন্য আসেন। রাখাল বিবাহিত ও ধনীর সন্তান। ঠাকুর রাখালকে ভালবাসতেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর রাখালকে নিজের করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত। সকলের গুরুভ্রাতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যখন স্থাপিত হয় তখন এঁকে সর্বাধক্ষ্যরূপে বরণ করা হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। সারদা দেবীর কাছে রাখাল ছিলেন ছেলের চেয়েও বড়।

তারপর এলেন তারকনাথ ঘোষাল। ঘটনাচক্রে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন ডাঃ রামচন্দ্রের ঘরে। তখনই ভাবে বিভোর হয়ে ওঠেন তারকনাথ। দক্ষিণেশ্বরে গেলেন একদিন। ঠাকুরের স্পর্শে নতুন প্রাণ পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আগে পিতার কাছ থেকে সন্ন্যাসের অনুমতি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাতলে আসেন। সন্ন্যাস জীবনের নাম শিবানন্দ।

এলেন বাবুরাম। স্বামী প্রেমানন্দ নামে' পরিচিত যিনি। ছাত্র জীবন থেকেই বাবুরাম ছিলেন সাধক ভাবাপন্ন। রাখালও ছিলেন তাঁর সহপাঠি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী প্রেমানন্দের শিক্ষক ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পরবর্তী জীবনে প্রকৃত জীবনের সন্ধান পেয়ে বাবুরাম হলেন স্বামী প্রেমানন্দ।

তারপর স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অগমানন্দ প্রভৃতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করেছেন। পরবর্তী জীবনে প্রত্যেকেই এক মহৎ জীবনের সন্ধানে অদ্ভুত কাজ করে জগতের বুকে অসাধ্য সাধন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি অমর ভক্ত সন্ন্যাসীদের জীবনও বিস্ময়ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

ভক্তপ্রাণ নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষকে ভালবাসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। থিয়েটার করতে করতে গিরীশ গালাগাল দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। ভক্তরা ভীত। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন। পরের দিন তিনি গেলেন গিরীশচন্দ্রের বাড়ীতে। নিলেন কুশল সংবাদ। নাট্যকারের চোখে জল। বললেন তুমিই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন গিরীশচন্দ্র। তিনি বলতেন : আমার ভক্তরা হচ্ছে, আমার সখা, আমার বন্ধু—।

গিরীশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিজেকে নিবেদন করে বললে : এখন তোমার উপর সব নির্ভর, আমি কি করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ অভয় দিলেন, যা করার তাই করবে তাঁর নামে বিভোর হবে। সকালে বিকালে তাঁর নামে গান গাইবে।

মহা বিপদগ্রস্ত নাট্যকার। কি যে করেন? অভিনয় নিয়েই তো তার জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সময় যদি না থাকে তাহলে শোবার আগে পারবি না?

তাতেও নিরুপায়। মন যে মানে না। কখন কি যে হয় গিরীশের? ঠাকুরকে নির্ভর করে আছেন গিরীশ।

ঠাকুর বললেন, বেশ তোর হয়ে আমি ভার নিচ্ছি। বকলমা দে আমাকে।

নিশ্চন্ত হলেন গিরীশ।

ঠাকুরের কাছে একবার এক কুষ্ঠরোগী এলেন। পরম বিশ্বাস তার, ঠাকুরের

স্পর্শে সে ভাল হয়ে যাবে। রোগ যন্ত্রণা উপশম হবে। কিছু থাকবে না। শুনে ঠাকুর বললেন, কই আমি তো কিছু জানিনে। তবে মার ইচ্ছে হলে সব সেরে যাবে।

পরবর্তীকালে ঠাকুর বলেছেন তাঁর শিষ্যদের কাছে, ভদ্রলোকের রোগ গেল কিন্তু তার রোগ এসে এই শরীরের 'পর দিয়ে চলে গেল।

এমনি করেই নিজের মধ্য দিয়ে অন্যের দুঃখ কষ্টকে নিজের করে নিতেন ঠাকুর। করুণায় বিগলিত। নয়নে অশ্রু, একদিন পথে যেতে পথের ধারে পতিতাদের দেখতে পেয়ে মায়ের রূপে তাদের প্রণাম করলেন মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ।

মনে পড়ে, শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেখলেন যেন তাঁর দেহের ভিতর থেকে আর একটা দেহ এসে খোলস ছেড়ে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিঠে অনেকগুলো ঘা কিন্তু ঘা কেন? ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে টের পেলেন, ও গুলো পাপীদের স্পর্শে। তারই জ্বালা নিজের হৃদয়ে।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁর ভক্তদের বললেন, মানুষের সেবার জন্য যদি তাঁকে বারবার পৃথিবীতে আসতে হয় তাও তাতে আপত্তি নেই।

কথায় কথায় পিঠের ঘা দেখার প্রসঙ্গ নিয়ে বললেন: দেখলাম সারা পিঠে ঘা হয়েছে। ভাবছি কেন হয়? মাকে ডাকলাম, মা জানালেন, মানুষের পাপ অনাচারের স্পর্শে এই ফল। ওদের যত পাপ সবই তো আমার বোঝা। কি করে ওদের তাড়াই! ওরা তো মানুষ। ওরাই তো সব।

বলতে বলতে ঠাকুরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ভক্তরা ঠিক করলেন অপরিচিত কোন লোক এসে ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারবে না। ঠাকুরের ঘরে কেউ আসতে পারবে না।

গিরিশ ঘোষ তাই শুনে বললেন, তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন? কেউ তা পারবে না। ঠাকুর এসেছেন আমাদের মত পাপী তাপীকে উদ্ধার করতে''

ঠাকুরের মুখে মধুর বাণী শুনতে পেয়ে কত প্রানে যে জ্বালা জুড়ায় তার ঠিক নেই। ঠাকুরের কথা তুলে অগণিত উদাহরণ দেখানো যায়।

তবুও নানা ফুলের সাজি থেকে কয়েকটি ঘটনা চয়ন করে পাঠকদের দিচ্ছি।

গৃহ সংসারকে ত্যাগ করে বীতরাগ হাজরা এলেন দক্ষিণেশ্বরে। গীতা আর সাধন ভজনে দিন কাটে। হাজরার মা রোগ শয্যায়। মৃত্যুকালে পুত্রের দর্শন চায়।

ঠাকুর শুনে বললেন, এখনই মাকে দেখে এসো। কিন্তু হাজরা গেলেন না। কেঁদে কেঁদে পুত্র স্নেহে বৃদ্ধা জননী চলে যায় অমর লোকে। তাই না শুনে

ঠাকুর রেগে গিয়ে বললেন, 'ওরে মা কেঁদে কেঁদে চলে গেল তুই আবার গীতা পড়িস? ধর্ম সাধনা করিস? শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বমানবের অন্তরে এক আশ্চর্য আলোর শিখা। মানুষের আনন্দে ও দুঃখে ব্যথা-বেদনায় ছিলেন সমব্যথী।

ছেলেকে হারিয়েছেন মণিমোহন মল্লিক। নিজের দুঃখকে দূর করে দেবার জ্বালায় ঠাকুরের কাছে এলেন মণিমোহন। বিষাদে ক্লান্ত মণিমোহন। ঠাকুর দেখেই বললেন, কি হয়েছে তোমার? শুকনো কেন মুখ।

অন্তরের ঠাকুর ভাবে বিভোরে উদাসীন। সান্ত্বনা সাগরে এসে মণিমোহন শান্ত। ঠাকুরের মুখে মধুর গান। চেতনায় অবসন্ন ঠাকুর। বললেন এ প্রসঙ্গে: পুত্র শোকের মত কি জ্বালা আছে?—ভগবানকে ডাক, তিনিই জ্বালা দূর করে দিবেন। চলে এলেন শান্তমনে। মণিমোহনের ঠাকুরের কাছে আসা সফল হয়েছে, কেননা এই অনিত্য সংসারে মায়া একটা ছলনা। ঠাকুর যা ভাল ভাবেন তাতেই তো তার মঙ্গল।

কোন স্ত্রী ভক্ত বললেন, ঠাকুর, সময় সময় মনে হয় ঠাকুরই যেন আমাদের।

মধুর ভাবাবেশে ঠাকুর হতেন যেন এক অপূর্ব মোহন রূপ। ঠাকুরের কাছে সবাই আপন হয়ে যেতো পুরুষ আর নারী দুই তাঁর কাছে সমান।

একদিন ভক্তবীর গিরিশ ঘোষ বললেন ঠাকুরকে, তুমি পুরুষ না প্রকৃতি।

অন্তরের ঠাকুর জেগে উঠলেন। অন্ধকারকে আলো দেখালেন পুরুষ আর প্রকৃতি, সবই তো এক। ভাবমুখে তার কাছে সবই যেন এক হয়ে মিশে গেছে। যেখানে এক সুরে বাধা একই চেনার রূপে। শ্রীকৃষ্ণের সখীভাবে নিজেকে ভাবতেন ঠাকুর তার কাছে সবই তো সমান। ঠাকুরের সাধনায় ঈশ্বরকে ঠাকুর এনেছেন তাঁর হৃদয়ে। অনাবিল আপন মহিমায় তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন। এইভাবে জগতের অসাধ্য সাধনায় পরম পুরুষ জগতের মাঝে আলো এনেছেন।

মণিহার থেকে মালা গাঁথা যায় সত্য, কিন্তু তাকে মনোমন্দিরে রাখা যায় কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। ঠিক তেমনি তাঁর কথা যতই বলব, ততই আবার বলতে ইচ্ছে করবে। যার আদি নেই, অন্ত নেই সেই পরম পুরুষের বিচিত্র জীবন লিপি থেকে স্মরণ তীর্থে জেগে ওঠে কত অভিনব বিচিত্র ঘটনা।

কত ঘটনা না শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঘটে গেছে—মনে পড়ে, প্রথম যৌবনে ঠাকুর জগদম্বার দর্শন লাভের পূর্বে কাঞ্চনাশক্তি ত্যাগ করতে, গঙ্গায় ধারে গিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তাই এক হাতে একটা টাকা ও আরেক হাতে মাটি নিয়ে বললেন "ও আমার চাইনে, ও আমার দরকার নেই।" তাঁর এই ভাবটাকে বিশ্বাস করতেন না নরেন্দ্রনাথ? শ্রীরামকৃষ্ণের

কাছে বসে গল্প করছেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বাইরে গেলেন; সেই অবসরে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বিছানার নীচে একটি টাকা রাখলেন। পরীক্ষা করবেন টাকার স্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের গা জ্বালা করে কিনা।

রামকৃষ্ণ এলেন। বিছানায় বসতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠলেন, বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: একি হলো, কে যেন আমাকে দংশন করলে—গায়ে জ্বালা করছে কেন?

নরেন্দ্র হতবাক। লজ্জিত হয়ে উঠলেন বীর সাধক। বিছানা থেকে টাকাটা বের করে আনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবক মথুরামোহন ভাবলেন, তাঁর অবর্তমানে ঠাকুরের যাতে কোন অসুবিধা না ঘটে, তাই ভেবে সেবক ভক্ত মথুর তাঁর জন্য দশ হাজার আয়ের একটা বিষয় দানপত্রে দলিল করে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই না শুনে রেগে উঠলেন, মারতে গেলেন মথুরকে, বললেন: তবে রে শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস। মথুর দলিল ছিঁড়ে ফেললেন।

একদিন এক ধনী মাড়োয়ারী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত নাম তার লক্ষ্মীনারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণের মনের বাসনা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নগদ দশ হাজার টাকা প্রণামী দিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে সে প্রণামী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিতে চান না। বারবার অনুরোধ করেন ভক্তপ্রাণ লক্ষ্মীনারায়ণ। বলেন দয়া করে নিন। আমাকে দয়া করে সেবার কাজে লাগাতে দিন।

ভক্তের কথা শুনে হাসেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তো কামিনী ত্যাগী পরম পুরুষ, কেমন করে নেবেন ভক্তের দেওয়া অর্থ?

আর লক্ষ্মীনারায়ণ তিনিও ছাড়েন না। অনুনয় বিনয় করে বার বার বলেন, দয়া করে নিন। আগ্রহ আকুতি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কি করবেন ঠিক না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত জননী সারদাকে লক্ষ্মীনারায়ণের দানের প্রস্তাব জানালেন।

কে জানে কোন্ রহস্যছলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরীক্ষা করেছিলেন অন্তরের লক্ষ্মীকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে, কিছুতেই ছাড়ছে না—কিন্তু আমি তো টাকা নিতে পারব না—কাজেই এ টাকা তুমি গ্রহণ কর।

সারদা জননী তখনই জানালেন: টাকা নেওয়া চলবে না, আমি নিলেও যা, তুমি নিলেও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের বাণীকে গ্রহণ করে সরলা রহস্যময়ী জননী এই দশ হাজার টাকা প্রত্যাখান করলেন।

ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কি সহজেই প্রত্যাখ্যান করে দিলেন নগদ দশ হাজার টাকা।

আমি তোদের গুরুরূপে তোদের কাছে এসেছি এই কথাটি কোন দিনই বলেননি পরমপুরুষ।

বলতেন সরল ভাবে, 'আমি কে, ঈশ্বরই সব।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই গুরুভাব জগতের কাছে এক দুর্লভ হয়ে আছে। সনাতন ও সংস্কৃতির অপূর্ব মিলনে তিনি তাঁর জীবনে যে লীলা দেখিয়ে গেছেন তার শেষ নেই সুরু নেই। কোন সময়েই তিনি নিজেকে প্রচার করেন নি, আমি তোদের গুরু। বার বার বলেছেন, মায়ের দীনতম সেবক। জগতের কল্যাণই আমার ধর্ম। তাই তার কথায় ও কাজে এক হয়ে সৃষ্টি হলো অপরূপ ভাবের বন্যা, যার প্রকাশে নতুন করে এগিয়ে এলো নবীন সন্ন্যাসী নবীন ভক্তের দলেরা।

ভ্রমর কলির গুঞ্জনের মধ্যে দেখা গেল পরম বিস্ময়। ভক্ত বলরাম বসু, ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ দুর্গাচরণ নাগ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বিরাট শক্তিমান পুরুষরা শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ধন্য করেছেন। তবুও তিনি বলেননি, আমি তোদের গুরু শুধু বলেছেন আমিই কে? সবই ঈশ্বর করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু বলতেন: তোমরা সৎপথে থেকো। তোমাদের চৈতন্য হোক। জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে যাও। আমাকে বিশ্বাস কর।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর আলোকিত। ভক্তদের বলতেন: অর্জুনের মত ভক্ত কই? তিনি তাঁর মন্ত্র শেখান ভালবাসায়। বন্যায় ধুইয়ে দিতে চান অন্তরের পঙ্কিলতাকে। শুচিশুভ্র হয়ে চিরশুদ্ধ হতে হবে সকলকে। বলতেন প্রায়ই, যা কিছু সবই তোদের জন্য।

ঠাকুর বলতেন, কই আয় তোরা, মা যে তোদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

মধুলোভী ভ্রমরের মতন একটি দুটি করে ঠাকুরের সামনে সরল হয়ে সহজ হয়ে ভক্তরা, সেবকরা, সাধুরা, গুণীরা একে একে জড়ো হলেন।

ঠাকুর তার আপন মহিমায় চেনালেন নতুন চেতনা।

লোক কল্যাণ সাধনে গড়েছিলেন পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে। মহামানব যীশু পিটারকে, অহিংসা পূজারী বুদ্ধদেব আনন্দকে, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে। আর পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তিল তিল করে সৃষ্টি

করলেন বিশ্বের কল্যাণে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কথা। অঘোরমণি নামে এক ভক্তিমতি নারী এলেন ঠাকুরের দর্শনে। অনেক লোকের ভিড়ে দেখা পেলেন তিনি। প্রথম দর্শনেই যেন অঘোরমণি পেলেন গোপালের দেখা। ঠাকুরকে দেখে তাঁর মনে হলো, এই তো সেই গোপাল। যাঁকে স্বপ্নে, জাগরণে নিত্য সেবা করেছি।

ছেলেকে পেয়ে মায়ের অন্তর কেঁদে উঠলো। চিরকালের মা যশোদা, আর গোপাল। ঠাকুরও যেন মাকে পেলেন। অঘোরমণি হলেন গোপালের মা।

অন্তরে অভিমান আর ব্যথা নিয়ে ফিরে এলেন মা। কয়েকদিন পর এলেন। ছেলের জন্য দু'পয়সার মিষ্টি নিয়ে গেলেন মা। অন্তরের ঠাকুর রহস্যময় হয়ে উঠলেন। বললেন: দাও, দাও আমার জন্যে কী এনেছ তুমি?

সাগ্রহে হাত বাড়ালেন ঠাকুর। আর গোপালের মা লজ্জিত হয়ে রয়েছেন, কেমন করে ছেলের হাতে তুলে দেবেন এই সস্তা সন্দেশ?

ঠাকুর বললেন খুশি হয়ে গোপালের মাকে, কিনে এনেছ কেন? কিনবার কি দরকার? ঘর থেকে চিঁড়ে, নারকেলনাড়ু আনবে। নিজের হাতে রান্না করে আনবে। যা আনবে তাই খাব। তোমার হাতের রান্না খাব?

গোপালের মা ভাবলেন, কি ব্যাপার? আমি দেখতে এসেছি সাধু। শুনব ধর্মের কথা। কিন্তু কোথায় গেল ধর্মের কথা? কেবল খাবার বায়না। আবদার কেন বাপু? না আর আসব না।

কয়েকদিন পর আবার এলেন অঘোরমণি. বললেন: নাও খাবার এনেছি।

পরম আগ্রহে অঘোরমণির হাতের রান্না খেতে খেতে বললেন ঠাকুর, বাঃ বাঃ বেশ লাগছে। রোজ আনবে?

দিন যায়, আবার দিন আসে। একটা অদ্ভুত আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে অঘোরমণি চলেছেন। ঠাকুরের যত আবদার সহ্য করছেন, শিশুর মতন যত্ন করে নিজের হাতের রান্না খাওয়াচ্ছেন। বিরক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে বললেন গোপালের মা। না আর আসব না। শুধু খাবার বায়না। কোথায় গেল ধর্ম? তার নাম গান।

অন্তরের ঠাকুর অলক্ষ্যে হাসলেন।

কিন্তু গোপালের মা যেন নিত্য দর্শন পেলেন তাঁর উপাস্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে। যখন গোপালের কথা ভাবেন তখনই যেন স্বয়ং ঠাকুর তার সামনে। একদিন এক স্বপ্নে পেলেন তার গোপালকে। দেখলেন তাঁর গোপাল যেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

আবার এলেন গোপালের মা।

ঠাকুর বললেন, আর এত মালা জপ কেন? যা পাবার তা তো পেয়েছো?

দিব্য দৃষ্টি পেলেন অঘোরমণি।

অঘোরমণি বললেন, ঠিক বলেছ? আমার সব কাজ শেষ হয়েছে।

অঘোরমণির মধ্য দিয়ে ঠাকুর দেখলেন এক অপূর্ব মহত্বের রস, যার মাধ্যমে সাধনার শেষ সীমায় গিয়ে ঈশ্বর দর্শন পেলেন।

'গোপালের মা' বলেই ডাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণর পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে অঘোরমণি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঐ কথা শুনে, আমি থলে সমেত জপমালা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এলাম। শুধু আমার ছেলের মঙ্গলের জন্য আঙ্গুলের পরে মালা জপ করতাম।

নারী ভক্তবৃন্দের মধ্যে যোগিনী মা, গৌরী মা, গোপালের মা চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন নানা দিক দিয়ে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুর বললেন, আজ সাগরে এসে মিশলাম, এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি, এবার সাগর দেখছি।

পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর যে সব মধুর আলোচনা হয়েছিল তার বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে ঠাকুর ঠনঠনিয়ায় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিকালে শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে দেখা করলেন।

গিয়ে দেখলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে। যাঁর নাম ডাক তখন সারা দেশময়। ধর্ম তথ্যের ব্যাখ্যায় তিনি একাধারে সর্বগুণের আধার। ঠাকুর বললেন, হাজার লেকচার দাও, ওতে কিছুই হবে না মায়ের কৃপা না পেলে সবই বৃথা।—

উঠল সমাধি প্রসঙ্গ। সমাধিস্থ হলেন। তর্কচূড়ামণি স্তম্ভিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, বাবা আর একটু বল বাড়াও, আরও কিছুদিন সাধন ভজন কর···।

তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গ উঠল, বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ ..."তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তি লাভ না হলো তা হলে তীর্থে গিয়ে কি লাভ? জগতের মাকে পেলেই জ্ঞান, ভক্তি সবই পাওয়া যায়।

ঠাকুরের কাছ থেকে এক উপদেশ ও আশীর্বাদ পেয়ে শশধর বুঝলেন জীবনের বৃহত্তর সন্ধানের মূলে কি দরকার।

পরশমণির স্পর্শে সজীব হলেন শশধর। তর্কচূড়ামণির কণ্ঠে শোনা যায়: দর্শন চর্চায় আমার হৃদয় শুকিয়ে আছে, আমায় এবার ভক্তি সাগরে ডুবিয়ে দিন।

শশধর পণ্ডিতকে আশীর্বাদ জানালেন—তারপর দেখা গেছে শশধর তর্কচূড়ামণি প্রচার বন্ধ করে দিলেন নিজের। শ্রীরামকৃষ্ণের পরশ পেয়ে তপস্তার জন্য চলে যান কামাখ্যায়।

এমনি করেই শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝালেন যে অন্তরের আলোতে অন্ধকারই দূর করতে হয়; কিন্তু মনের অন্ধকার থাকলে তা দূর হতে পারে না। অন্ধকারে সে তো চিরদিনই তমোময়ী রাত্রির দুঃস্বপ্ন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। ভক্ত অধর সেনের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র। অনেক কথার পর বঙ্কিমচন্দ্র বললেন: ঈশ্বরকে পাব কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ব্যাকুলভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।

তারপর আরেক দৃশ্য। ভাবাবেশে সমাধিস্থ হলেন। তার আগে কীর্তন। সমাধি ভঙ্গে নৃত্য করলেন ঠাকুর। প্রাণভরে অভিনব দৃশ্য দেখলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।

কয়েকদিন পর ঠাকুরের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠালেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'দেবী চৌধুরাণী।'

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল এসেছেন ঠাকুরের সংগে দেখা করতে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ। তবে হিন্দু জুতো বাইরে রাখলেন। একটা কথা কয়ে দেখলুম ভিতরে কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করলুম মানুষের কি কর্তব্য। তা বলে? জগতের উপকার করবো। আমি বললাম—হ্যাঁ গা, তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগতের কতটুকু তুমি উপকার করবে? (শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত)

এমন করেই ঠাকুর কৃষ্ণদাস পালের অহংকার চূর্ণ করে দিলেন।

এমনি আরও অনেক অমূল্য তথ্য ছড়িয়ে আছে যা বলে শেষ করা যায় না।

ঠাকুরের উপদেশ ও বাণী আমাদের কাছে পরম বিস্ময়। আজ তাঁর বাণী সারা ঘরে ঘরে, সারা বিশ্বে সমাদৃত। তাঁর বাণীর মধ্য আমরা পাই জীবন সাধনায় সত্য পথের নিশানা। তাঁর পুণ্যময় বাণী এক সঙ্গে চয়ন করা আমাদের দুঃসাধ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' গ্রন্থ থেকে কিছু বাণী চয়ন করে পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি বলতেন মধুর করেই "মানুষ আপনাকে চিনতে

পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। আমি কে, ভালরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় 'আমি' বলে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটি আমি? যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল বেরোয়, কিন্তু সার থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমিত্ব' বলে কিছু পাইনি। শেষে যা থাকে তাই আত্মচৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন।"

মায়া প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন নানা ভাবে, প্রসঙ্গত মনে পড়ে তাঁর অমর বাণীতে, "মায়ার স্বভাব কেমন জানো? যেমন জলের পানা। ঠেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি পুরে এলে। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধু সঙ্গ কর, যেন কিছুই নেই। পরেই বিষয় বাসনা আবরণ করে।

আরও বলেছেন: "মায়া কাকে বলে জান? বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র ভাইপো, ভাইঝি এইসব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও ভালবাসা, আর দয়া মানে সর্বভূতে আমার হরি আছেন এই জেনে সকলকে ভালবাসা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিতে গিয়ে জীবের অবস্থা ভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'মানুষ যেমন বালিশের খোল, বালিশের ওপর দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কালো, কিন্তু সকলের ভেতরে সেই এক তুলা। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কাল, কেউ সাধু, কেউ অসাধু কিন্তু সকলের ভিতর সেই একই ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।"

আরও সহজ করে সরস করে এ প্রসঙ্গে বলতেন ঠাকুর: যে মূলো খেয়েছো, তার ঢেঁকুরেতেই টের পাওয়া যায়, তেমনি যে ধার্মিক তার সঙ্গে আলাপ করলে সে কেবল ধর্ম প্রসঙ্গই করে থাকে, আর যে বিষয়ী, সে বিষয়েরই কথা বলে থাকে।"

জীবের অবস্থা ভেদ প্রসঙ্গে তাঁর অমৃতময় উপদেশের একটি উপদেশ দেখা যায় "জল সব নারায়ণ বটে। কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় পাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, আবার কোন জল ছোঁয়া পর্যন্ত যায় না, তেমনি কোন জায়গায় যাওয়া যায়, ও কোন জায়গায় দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়।

ধর্ম উপলব্ধির বস্তু পাঠ্য বা বিচারের বস্তু নয় এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলতেন: "শাস্ত্র বিচার কতদিন দরকার জানো? যতদিন না সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হন। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ না ফুলে বসে ততক্ষণ গুনগুন করতে থাকে, আর যখন ফুলের উপর বসে মধুপান করে তখন একেবারে চুপ, কোন শব্দ করে না।"

একদিন কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন কিন্তু তাঁদের ফললাভ হয় না কেন? ঠাকুর জবাব দিলেন: যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? তাদের মন সর্বদা কামকাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুণ জ্ঞানলাভ করতে পারে না।"

ঠাকুর বলতেন: হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় হরিনাম করো তাহলে সব পাপতাপ চলে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ-গাছ থেকে অবিদ্যা-রূপ পাখী উড়ে পালায়।

ছোট ছোট উপদেশ আর অমৃতময় বাণীর মধ্য দিয়ে ঠাকুর রূপটি তুলে ধরতো তা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের বোঝা অসাধ্য।

নবজীবনের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। ভাগীরথীর কলকল্লোলে দক্ষিণেশ্বর আজ হয়েছে অপরূপ। ধ্যানে মগ্ন। তপস্যায় শুভ্র ও সুন্দর। দিনে দিনে ভক্ত বাড়ছে। ঠাকুরের কণ্ঠে মধুময় বাণী শুনে ধন্য সবাই। যুগ নারায়ণ তখন এগিয়ে চলেছেন অমৃত পথের দিকে।

জগতের যত দুঃখ, যত আনন্দ যত আশা সমস্তই তো তারই ইচ্ছায়।

'যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণ। তবে এবার ছদ্মবেশে। শ্রীমুখে নিজেই বলেছেন ঠাকুর। ভক্তদের সংশয় মেটাতে নিজেই নিজেকে সাজিয়েছেন অপরূপ ভাবের বন্যায়। যুগ যুগান্তরের সাধনার তপস্যায় নিজেকে বিলীন করে দিয়ে একটা অনন্ত শিখা নিয়ে ঠাকুর ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন "দেখবি একদিন ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।" আজ তাঁরই নামে মুখর হয়ে আছে।

মনে পড়ে একটা ঘটনা মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণকে গিরীশ ঘোষের থিয়েটার দলের অভিনেত্রী বিনোদিনীর ও শ্রীচৈতন্য লীলা নাটকে অভিনয় দেখে ঠাকুর খুব প্রশংসা করেছিলেন। ঠাকুরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার অধিকার পেয়ে বিনোদিনী ধন্য হয়েছিলেন। পাদস্পর্শে মূর্চ্ছা গেল বিনোদিনী! আর সেদিন থেকে বিনোদিনী ঠাকুরের পরম ভক্ত। নিত্য তার ঠাকুরের নাম গান। যখন বিনোদিনী শুনলে ঠাকুর অসুস্থ, তখন কান্নায় অধীরা হয়ে উঠলো।

কেঁদে কেঁদে বললে বিনোদিনী, ঠাকুরকে দেখতে যাব। তার পদধূলি নিয়ে জীবনকে ধন্য করব।

নাট্যকার গিরীশ ঘোষ বললেন, না, এখন তো যাওয়া হবে না। তাছাড়া তোমাদের তো নয়ই।

কিন্তু বাধা আর মানবে না বিনোদিনী। অন্তরে যাঁর মূর্তি ধ্যান করছে সে তাঁকে যদি নাই বা দেখলাম, তাহলে এ জীবনের কি দাম? শেষপর্যন্ত নিজের বেশ পরিবর্তন করে সাজলে এক ইংরেজ যুবক। সে বেশেই সে চললে। খাস বিলাতী ইংরেজ এসেছে ভেবে ভক্তরা কেউ বাধা দিলেন না। ভাবলেন তাঁরা দূর থেকে দেখেই চলে যাবে।

ঠাকুর শয্যাগত। সেই সময় সন্ধ্যাকালে এসেছে বিনোদিনী। সঙ্গে থিয়েটারের কর্মচারী কালিপদ ঘোষ। দেখলে বিনোদিনী। রামকৃষ্ণ রোগজীর্ণ, অসুস্থ। অন্তরের অন্তস্থল কেঁদে উঠল তার কান্নায় বিলীন হয়ে বললে বিনোদিনী, একি হয়েছে ঠাকুরের?

ঠাকুর সস্নেহে বললেন: কে বিনোদিনী?

অশ্রু সজল কণ্ঠে বললে সে, হ্যাঁ আমি।

দুচোখে অশ্রুর বন্যা। পাদপদ্মে অশ্রুর প্রণাম।

মহাসমাধির কয়েকদিন আগে এলেন ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ। আশ্চর্য সাধক নাগ মহাশয়।

ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। পাদপদ্মে বসে আছেন তিনি।

ঠাকুর বললেন, এসেছিস। ওরে দুর্গাচরণ—ডাক্তার তো পারলে না তুই কি পারবি এ রোগ সারাতে?

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন দুর্গাচরণ।

ঠাকুরের নির্দেশ নিয়ে লোক কল্যাণের সেবায় ছেড়ে দিয়েছে চিকিৎসা। দীনতার মূর্ত প্রতীক। আশ্চর্য বিচিত্র নাগ মহাশয়। ঘরে বসে অন্যান্য ভক্ত সাধক। তাঁরা মনে করলেন ঠাকুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কথা বলছেন। ভগবানের ডাকে ভক্তের সাড়া পাওয়া যায়।

দুর্গাচরণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন; পারব।

ভক্তরা উল্লসিত। বললেন তাঁরা: পারবেন?

এগিয়ে এলেন নাগ মহাশয়। চোখে মুখে আনন্দের বন্যা।

ঠাকুরের বুকের পাশে এসে ধ্যানমগ্ন দুর্গাচরণ। চোখে মুখে আত্ম-দানের আনন্দ। গুরুর জন্য নিজের তুচ্ছ প্রাণের বলি। এর চেয়ে জগতে কি আর দুর্লভ বস্তু আছে? আনন্দে পুলকিত প্রেমভরে বিগলিত।

অন্তরের ডাকে সাড়া দিলেন ঠাকুর। ভাবের জগত থেকে ফিরে এলেন ভাবের হাটে।

দুর্গাচরণকে সরিয়ে দিয়ে, ভাবাবেগে বলে উঠলেন পরম পুরুষ, বললেন:

ওরে দুর্গাচরণ, নিজের জীবন দিয়ে যে রোগ সারাতে পারিস তাকি কখনও নিতে পারি আমি?

দীন সেবক দুর্গাচরণের চোখে জল।

ঠাকুর বললেন: তোদের যত দুঃখ জ্বালা আছে সবই তো আমার।

আনন্দে উথলে উঠলো সবাই। সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলেন ভক্তরা। স্বয়ং ভগবানকে কাছে পেয়েছে, তারাই তো দেখেছেন অনাদিকালের সেই একই পূর্থসারথি যুগনারায়ণ এসেছেন অমৃতের পূর্ণপাত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এ ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী পানিহাটিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা।

ঠাকুর যাবেন, তাঁর ভক্তদের নিয়ে।

ঠাকুর বললেন, আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসবে। তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, কখনো দেখিসনি। চল্ চল্ দেখে আসবি। হরিনামের হাটের বাজারে গিয়ে পরমানন্দে গান গেয়ে আসবি।

ঠাকুর ভাবাবেগে সকলের প্রাণে আনন্দের সাড়া জাগল। ভক্তের ডাকে ভগবান হাসলেন। কিন্তু সংশয় দেখা দিল ঠাকুরের গলায় অসুখ বাড়তে পারে। অনেকেই বললেন এ নিয়ে এ কথাই। ঠাকুর সহাস্যে বললেন, ভয় নেই রে, কিছুই হবে না।

ঠাকুরের কথা শুনে ভক্তরা আশ্বাস পেলেন। উৎসবের দিনে সকাল থেকেই অনেক ভক্ত এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁরাও যাবেন এই পুণ্য মহোৎসবে। দু'খানা নৌকা ঠিক হল। একটাতে ঠাকুর যাবেন আলাদা, আর অন্যটাতে ভক্তরা। প্রায় জন ত্রিশ ভক্ত চলেছেন এই উৎসবে।

পানিহাটিতে নৌকাগুলো এলো, সেখানকার গঙ্গার তীরে প্রাচীন বটগাছের তলায় চলেছে কীর্তনের ঢেউ, তারই সুরে মেতে উঠেছে ভক্ত প্রাণেরা। ঠাকুরকে ভক্তরা বার বার বললেন, ঠাকুর যেন কীর্তনে না যোগ দেন।

নৌকা থেকে নেমেই সোজা ঠাকুর এলেন মণি সেনের বাড়ীতে। ভক্তপ্রাণ মণি সেনের বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন তাঁর ভক্তদের নিয়ে। ঠাকুরের আবির্ভাবে ধন্য হলেন গৃহস্বামী মণি সেন ও অন্যান্য লোকজনেরা। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মণিবাবুর ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর দর্শনে গেলেন। মন্দির বিগ্রহ দর্শন করেই ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। ভাবের আবেশে অর্ধচেতন অবস্থায় ঠাকুর প্রণাম জানালেন। সহসা কোথা থেকে ছুটে এলো

একটি কীর্তনের দল। শান্তভাবে ঠাকুর দেখছেন সব। দলপতি ফোঁটাতিলক ধারী গোঁসাইজীর বেশ-ভূষাতে ঠাকুর বুঝলেন দুপয়সা রোজগারের আশায় এসেছে এই কীর্তনের দল। গোঁসাইজীর ভাবাবেগ দেখে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন 'দেখ দেখ ঢং দেখ।' ঠাকুরের কথা শুনে ভক্তরা নিশ্চিন্ত হলেন আর যাই হোক ঠাকুর বেশ সুস্থ আছেন। কিন্তু ঠাকুরকে আটকায় কে? ঠাকুর সাহস পাগলের মত ছুটে গেলেন কীর্তনের মধ্যে। স্থির হয়ে তিনি রইলেন। আবার ভাবে বিভোরে আবেগে দলের মধ্যে নাচতে শুরু করলেন তিনি। হরিনামের হাটে এসে নিজেকে দেউলিয়া করে দিলেন। ভাবের বন্যায় মধুর নাম। সমবেত জনতা স্তব্ধ। লক্ষ্য তাদের ঠাকুরের দিকে। মহানন্দে সবাই দেখছেন ঠাকুরের জ্যোতির্ময় ভুবন মোহন রূপের মধ্যে দিব্যোজ্জ্বল একটি জ্যোতি। ভাব প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে অপার করুণায় ধন্য সকলে।

ভক্তরা সবাই বিস্মিত। ঠাকুরের ভাব বন্যায় ভক্তির উৎসাহে সবাই আজ মাতোয়ারা। ভাবের আবেগে গঙ্গাতীরবর্তী রাজপথ দিয়ে ঠাকুর তাঁর ভক্তদের নিয়ে চলেছেন রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে। গগনভেদী স্বরে কীর্তনের দল সুরের বন্যা ছড়িয়েছে, তারা গাইছেন:

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কেরে?
বুঝি প্রেম দাতা নিমাই এসেছে?
ওরে হরি বলে কেরে
জয় রাধে বলে কেরে
বুঝি প্রেম দাতা নিমাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিমাই এসেছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত)

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটি কীর্তনের দল চলে এলো, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল আনন্দ। বিশাল জনতা ঠাকুরকে ঘিরে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। আজ এসেছেন ধরার ধুলায় প্রেমের ঠাকুর, মুক্ত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। পবিত্র হয়েছে এই পুণ্য পানিহাটির মহোৎসব।

তিন ঘণ্টার পরে ঠাকুর এলেন রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে। মন্দিরের দর্শনের পর বিশ্রাম করে নৌকায় ফিরলেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুর, রাত তখন সাড়ে আটটা।

পরিশ্রান্ত তিনি। মনের আনন্দ নিকেতনে তাঁর মন উধাও আরেক রহস্যময় জগতের তীরে।

সেদিন ফিরে এসে কোন্ এক বালক ভক্তকে বলেছিলেন : "কিরে দেখলি? হরিনামের একেবারে হাট বসে গিয়েছিল নয়-কি?"

এগিয়ে আসে কাল।

মহাকালের ডাকে ঠাকুর আসেন এগিয়ে। জগতের সমস্ত কিছু'কে নিজের করে নিয়ে রোগশয্যায় তীরে এলেন ঠাকুর।

পানিহাটির মহোৎসব যোগদানের পর থেকেই ঠাকুরের গলার ব্যথা বেড়ে গেল। চিকিৎসা চলেছে। কিন্তু কোন ফল হয় না। দক্ষিণেশ্বরে দিনে দিনে ভক্তের দল এসে জড়ো হচ্ছে। ঠাকুরের দর্শন, অভিনব কথা বার্তা, ঠাকুরের মুখে মধুর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে নতুন লোক আসছে।

নিদ্রাহীন, বিশ্রাম নেই ঠাকুরের। ভক্তজনেরা চিন্তিত।

ঠাকুর বললেন, ভয় কি রে?

মনে পড়ে, গলার রোগ হওয়ার বছর চারেক আগে মাকে বলেছিলেন, যে দিন দেখবে যার তার হাত দিয়ে আমার খাবার আয়োজন হচ্ছে, আমি যাচ্ছি। সেদিন বুঝবে আর বেশী দেরী নেই।

দিন এসেছে। ক'মাস পরে গলা দিয়ে রক্ত বের হল ঠাকুরের।

কি করবেন ভক্তরা?

ভক্তদের মধ্যে দেখা গেল হতাশার বেদনার চিহ্ন। বিন্দুমাত্র দেরী না করে চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের একটা ভাড়াটে বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো।

আনন্দময়ী জননী সারদা তখন দক্ষিণেশ্বরে। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এলেন ঠাকুর। সঙ্গে ভক্ত জনেরা। চিকিৎসার ভার নিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। প্রথম দিন ভিজিট নিয়েছিলেন—কিন্তু তার পর থেকে আর ভিজিট নেননি ডাক্তার সরকার।

খবরটা গেল মায়ের কাছে। খবর পেয়েই চলে এলেন সারদা। ভক্তরা করছিলেন চিন্তা, শ্যামপুকুরের এই একমহল বাড়ীতে কেমন করে থাকবেন মা।

মায়ের আর কোন বাধাই নাই আজ। চির আনন্দের যিনি আনন্দময় তাঁর কাছেই তো সব খুঁজে পাওয়া যায়। চির গোপনবাস জননী এলেন শ্যামপুকুরে। সেবাময়ী সারদা নিলেন ঠাকুরের ভার। কিন্তু মহাকালের গতিতে আরেক রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য এগিয়ে চলে…

ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকারের বন্যা।

তবুও ঠাকুরের শ্যামপুকুরে আসার পর থেকেই ভক্তদের আনাগোনায় মুখরিত। তাঁদের সেবা, মায়ের আন্তরিকতা, ডাক্তারের একনিষ্ঠায় ঠাকুর

বুঝলেন এদের কোন চেষ্টাই সফল হবে না। কেনো দিন এগিয়ে এসেছে—রোগ বেড়ে চলেছে। কি করা যায়? কলকাতার দূষিত হাওয়া থেকে সরিয়ে এনে ঠাকুরকে আনা হয়েছে কাশীপুরে।

সারদা মা কাশীপুরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ঠাকুরের সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ আইন পরীক্ষার জন্য তৈরী হলেন।

সেবাব্রতীদের অভাব। নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন। একদিকে অর্থের সমস্যাও। বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। একদিকে তখন নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক কলহ। তবুও সব কিছুকে ভুলে গিয়ে গুরুর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন নরেন্দ্রনাথ।

কাশীপুরের বাড়ীটার ভাড়া অনেক। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, দেখ সুরেন বাড়ী ভাড়ার টাকাটা তুমি দিও।

ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে।

বলরাম বসু প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। ঠাকুরের কলিকাতার বাইরে চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন বলরাম বসু।

শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুরে আসার পর ঠাকুরের কাছে ছুটে এল দলে দলে ভক্ত আর সাধকরা। ঠাকুরের মধুর বাণীতে দিকে দিকে আশার আলো জেগে উঠেছে।

গিরীশ ঘোষ বললেন: ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছি আমার ভয় কি?

লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে ছায়ার মতন তাঁরে এসে সেবা করে চলছেন।

কাশীপুর বাগান বাটীর বিস্তীর্ণ উদ্যানে ঠাকুর এসেছেন—। অগনিত ভক্তদের সমাবেশ।

ভক্তজনের প্রাণে আনন্দ—।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখার জন্য আসতে সুরু করলে ভক্তরা।

লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই নিজেকে একান্ত সরিয়ে দিয়ে মায়াময়ী মা সারদা তাঁর কাজ করে চলেছেন একান্ত নিষ্ঠার মধ্যে।

লাটু মহারাজ ঠাকুরের পাশে পাশে।

গৃহত্যাগী বারোজন ভক্ত অসামান্যভাবে সেবা করে চলেছেন।

সেবার সংগে সংগে নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় সাধকরা ভজনশাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন থাকেন।

ঠাকুর বাগানবাড়ীতে পায়চারী করছেন। সামনে তাঁর ভক্তজনেরা।

ঠাকুর বললেন: তোমাদের আর কি বলব। তোমাদের চৈতন্য হোক। সৎপথে থেকো!

মহাকাল হাসে, নিয়ত দিন চলে যায়। চারিদিকে শুধু ভিড় আর আকুতি-মাখা প্রশ্ন।

ঠাকুরের এই রোগ সারবে কবে? কবে আবার নিরোগ হয়ে ঠাকুর তাঁদের মন ভরিয়ে দেবেন।

তবুও, মায়ের মন মানেনা। ছুটে চলে গেলেন তারকেশ্বরে। নিবিড় ঘন অন্ধকারে তারকেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে সবার মা সারদা। শ্রাবণের ধারায় উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়, মনের মধ্যে অশান্ত জ্বালা। এই রোগ যন্ত্রণা থেকে ঠাকুর কবে সেরে উঠবেন? হঠাৎ যেন একটা অদ্ভুত জগতে ফিরে এলেন সারদা। তিনি দেখলেন সামনের ঘন অন্ধকার আর এই নিবিড় রাত্রিকে ভেদ করে ভেসে আসে কার কণ্ঠ: এ সংসারে কে কার? সবাই মায়ার বন্ধনে বাঁধা।

তারকেশ্বর থেকে ফিরে আসার পর ঠাকুর বললেন, কি গো কিছু হল?

চির মধুর রহস্যময় ঠাকুর—।

কিন্তু আবার আশার আলোক থেকে নেমে এলো অন্ধকারের বন্যা।

ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হল।

দিন এগিয়ে চলে।

তবুও দিন কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আসে সেই চরম সংকটময় তামসী রাত্রি।

মহাকাল হাসে।

কাশীপুরের বাগানে বসে নির্জন ধ্যানে তরুণ নরেন্দ্রনাথ।

কে জানে কোন গভীর রহস্যতীরে আজ এসেছেন বীর সাধক বিবেকানন্দ। হয়ত সেদিন তাঁর মনের মানস পটে ভেসে উঠেছিল একদিন অশান্ত মনের তীব্র বেদনায় ছুটে এসেছিলেন পরম পুরুষের কাছে।

আজ মহাকালের ডাকে তাঁর চলে যাওয়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

নির্জন ধ্যানে বিলীন নরেন্দ্রনাথ।

রুগ্ন শয্যাশায়ী ঠাকুর, দোতালার ঘরে—। নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে বললেন, দেখ নরেন তোর হাতে এদের দিয়ে যাচ্ছি।

নরেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। ঠাকুর বললেন, জীবের জন্যই তোর আসা। আমার সমস্ত কিছু তোকে দিয়ে গেলাম।

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত।

ঠাকুর বললেন, চুপ করে কেন? কথা বল?

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত। চোখে জল তাঁর। ঠাকুর হাসলেন। নরেন্দ্রনাথ

দেখলেন যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে আগামী কালের জন্য তৈরী হতে বলছেন। ঠাকুরের সর্বত্যাগে মহীয়ান হয়ে উঠতে হবে তাঁকে। নরেন্দ্রনাথ কান্নায় ডুবে গেলেন, অপূর্ব আলোকের সন্ধান পেয়ে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে চিনতে পারলেন।

রোগশয্যায় ঘিরে মহাসমাধিস্থ হলেন ঠাকুর। তারই ছায়াতলে জেগে উঠলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর দেহ রাখলেন।

আর রেখে গেলেন তাঁর মধুর বাণী পথহারা মানুষের আশার আলো জাগাতে রেখে গেলেন এক বিরাট কর্ম প্রবাহ।

মৃত্যুর আগে সারদা মাকে বলে গেলেন: তুমি থাক, অনেক কাজ আছে।

লোক কল্যাণে জীবের মঙ্গল মা সারদাকে ঘিরে জেগে উঠল অগণিত সন্তান। গুরুর নামে জয়ধ্বনি করে জেগে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আর সেই বিরাট কর্মপ্রবাহের ডাকে ছুটে এলেন রামকৃষ্ণ পতাকাতলে অগণিত ভাব সাধকরা।

স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই কাজ। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আজ ভারতের জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে পরমপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণীকে স্মরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আলোকের সন্ধানে। আজ সারা জগত জুড়ে চলেছে তাঁরই নাম গান।

আজ যে দিকে তাকাই সেদিকেই মুখর হয়ে আছে ঠাকুরের নাম।

মনে হয়, অন্ধকারের তীরে দাঁড়িয়ে কুহেলীবিলীন তমসাবৃত মনে কার জ্যোতির্ময় শিখার স্পর্শে বিস্ময়ে চমকে উঠি, মহাসমুদ্রের কলতান শোনা যাচ্ছে।

দিগদিগন্ত আজ মধুর হয়ে উঠেছে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে।

চির জীবনের শাশ্বত ধ্রুব তারার মত চিরসুন্দর, চিরসত্য, চির মধুময়। ঠাকুরের পুণ্য জীবনের কাহিনী কি করে শেষ হয় তা আমার জানা নেই, এ গ্রন্থ শুধু তাঁরই দীনতম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সমাপ্ত